গুণীজনের
অলৌকিক অভিজ্ঞতা



অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সাধনা

গুণীজনের

অলৌকিক অভিজ্ঞতা

গুণীজনের

অলৌকিক অভিজ্ঞতা



অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সাধনা

সাধনা

এক পত্রভারতী উদ্যোগ
www.bookspatrabharati.com

প্রথম প্রকাশ জুন ২০১৯

অন্বেষা চ্যাটার্জি কর্তৃক সাধনা, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯
থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ **মানস চক্রবর্তী**

বিক্রয়কেন্দ্র পত্রভারতী। ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯

প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশ
কোনও মাধ্যমের সাহায্যে কোনওরকম পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।
এই শর্ত না মানলে যথাযথ আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

GUNIJONER ALOUKIK OBHIGGOTA
by Apurba Chattopadhyay
Published by SADHANA BHARATI, 1/1Brindaban Mallick Lane, Kolkata 700 009
Phones 23501944, 94330 75550, 98308 06799
E-mail sadhanabharati2019@gmail.com
visit at www.facebook.com/PatraBharati-521504074559888

ISBN 978-81-94126-11-9

আমার অবেলায় হারিয়ে যাওয়া মা
শ্রীমতী গীতা চট্টোপাধ্যায়কে

মুখবন্ধ

বেশ কিছুকাল আগে বর্তমান পত্রিকার রবিবারের পাতায় শুরু হয়েছিল এক ধারাবাহিক লেখা 'গুণীজনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা'। লেখক আমার খুবই স্নেহের পাত্র শ্রীমান অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়।

কৌতূহল নিয়ে আমি প্রায় প্রতিটি সংখ্যা পড়ি ও পড়ে বেশ বিস্মিত হই। অনেক ঘটনা যেমন অনেকের জানা, আবার তেমনই বেশ কিছু ঘটনার কথা খুব কিছু প্রচারিত নয়। অপূর্ব যথেষ্ট গবেষণা ও পড়াশোনা করে এইসব বিরল সাধুসন্ত মনীষীদের অজানা আশ্চর্য ঘটনাকে লিপিবদ্ধ করেছে, এ সত্যই পরিশ্রমসাধ্য কাজ।

অপূর্বকে সস্নেহ অভিনন্দন জানাই। আমি নিশ্চিত, এই বইটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে।



সেবাইত, লেক কালীবাড়ী
১৮ মে ২০১৯

শুরুর আগে

আত্মারা সব হারিয়ে গেলেন! অদ্ভুত, কিম্ভুত এবং অবশ্যই স্বার্থপর আমাদের দৌরাত্ম্যে তাঁরা আজ বাস্তুহারা, গৃহহারা, সমাজহারা প্রেতে পরিণত হয়েছেন। তাঁদের তৈরি প্রেতলোকের অস্তিত্ব আদৌ এখন আছে কিনা তা নিয়েও আমার যথেষ্ট সংশয় আছে।

এই কয়েকটা লাইন পড়ার পর আপনাদের মনে হতেই পারে, যেসময়ে মঙ্গলের মাটিতে মানুষ পা দিতে চলেছে, কত অদ্ভুত ঘটনা ঘটানো সম্ভব হচ্ছে, সেই সময় কেন এই প্রলাপ!

প্রলাপ নয়! আসলে প্রমাণ ছাড়া আমাদের যুক্তিবাদী মন কোনও কিছুই মানতে রাজি নয়। এবং সেটাই হওয়া উচিত। একটা সময় আমিও তাঁদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করতাম না। তবে আজ এই মুহূর্তে আমি বলব, তাঁরা অবশ্যই আছেন। হয়তো আমার পিছনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিয়ে এইসব আলোচনা চলছে বলে তাঁরা মুচকি মুচকি হাসছেন।

আজ থেকে তেইশ বছর আগে আগস্টের এক রাতে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল, আমাদেরই বাড়িতে। সেইদিন ওইসময়ে যাঁরা আমার বাড়িতে ছিলেন তাঁরা সবাই আজও জীবিত। শুধু একজন বাদে।

সেই শ্রাবণের রাতে মৃত্যুর সঙ্গে প্রবল পাঞ্জা লড়ছিলেন আমার মা। আর আমার মাকে ঘিরেই সেই রাতে ওই ঘটনাটি ঘটেছিল। এখানে প্রমাণ হিসেবে সংক্ষেপে সেই রাতের ঘটনাটি আপনাদের শোনাব।

মায়ের প্রেশার তখন খুবই কম। ডাক্তারবাবুর নির্দেশে তাঁর সহকারী সেদিন আমাদের বাড়িতে থেকে গেছেন। তখন মোবাইল ফোন ছিল না। তিনি অত রাতে ল্যান ফোনে ডাক্তারবাবুকে ধরে সব কিছু জানালেন। ওপ্রান্ত থেকে নির্দেশ এল প্রাণদায়ী ওষুধ অর্থাৎ শেষ চেষ্টা হিসেবে শক্তিশেল ছাড়তেই হবে। সহকারী সেইমতো হাইড্রোকর্টিসন-এর অ্যাম্পুল ও সিরিঞ্জ নিয়ে তাঁর কাজকর্ম শুরু করলেন।

আমরা সবাই তখন মাকে ঘিরে বসে আছি। মায়ের মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছেন আমার পিতৃদেব। সবাই খুব বিষণ্ণ।

ঠিক সেইসময় বহুদিন বাদে একটি পরিচিত বিদ্যাসাগরী চটির শব্দ শুনে আমরা সবাই দোতলার সিঁড়ির দিকে তাকালাম। দোতলায় কেউ আর সে রাতে যাবে না বলে আলোগুলো নিবিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

একতলার আলোতে দোতলার সিঁড়ির ল্যান্ডিংটা বেশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল। সেখানে তখন একটা অবয়ব ধীরে ধীরে জমাট বাঁধতে শুরু করেছে। খুবই চেনা চেহারা। সাদা ধবধবে গেঞ্জি পরিহিত ঋজু চেহারার এক বৃদ্ধ মানুষ আমার মায়ের দিকে অসহায়চোখে তাকিয়ে আছেন। অদ্ভুত এক দৃশ্য। ঘোর কাটল আমার বাবার কণ্ঠস্বরে, বাবা আপনি?

ম্যাজিশিয়ানের জাদুদণ্ডের ছোঁয়ায় যেমন কোনও জিনিস হঠাৎই অদৃশ্য হয়ে যায় ঠিক তেমনই বাবার কথা শুনে আচমকাই শূন্যে মিলিয়ে গেলেন তিনি। তার পরদিন সকাল আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে আমার মা চলে গেলেন অন্য এক লোকে। ভিন্ন এক জগতে।

এই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ আধুনিক মানুষ ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবও প্রেতাত্মার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভক্তদের বলতেন, হঠাৎ নাকে কোনও দুর্গন্ধ ভেসে এলে এবং কোথাও তার কোনও উৎস খুঁজে না পাওয়া গেলে বুঝবে কোনও নিকৃষ্ট আত্মা ওইস্থান দিয়ে সেই মুহূর্তে চলে গেলেন। আর সুগন্ধ পেলে বুঝবে কোনও ঐশী আত্মা ওই স্থান অতিক্রম করলেন।

ঠাকুরের কথা যখন এসেই পড়ল তখন তাঁর ভূত দর্শন দিয়েই শুরু করছি 'গুণীজনের অলৌকিক অভিজ্ঞতা'-র প্রথম পর্ব।

অপূর্ব চট্টোপাধ্যায়

সূচিপত্র



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব ও বেণী পালের বাগানের ভূতেরা

বেণীমাধব পাল, ঠাকুরের ব্রাহ্ম ভক্ত। সিঁথির মোড়ে তাঁর বিশাল উদ্যান বাটী, যা আজও বেণী পালের বাগান বাড়ি নামে খ্যাত। তিনি বছরে দুবার খুব বড় করে অনুষ্ঠান করতেন। একবার শরৎকালে, তারপর বসন্তে। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সেই অনুষ্ঠান চলত। কথামৃতকার শ্রীমর লেখা থেকেও জানা যায় ঠাকুর তিনবার বেণীমাধব পালের বাগান বাড়িতে তাঁর পার্ষদদের নিয়ে এসেছিলেন।

১) ২৮ অক্টোবর ১৮৮২, শনিবার, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি।

২) ২২ এপ্রিল ১৮৮৩, রবিবার, চৈত্রমাসের পূর্ণিমা তিথি।

৩) ১৯ অক্টোবর, ১৮৮৪, রবিবার, কার্তিক মাসের শুক্লা প্রতিপদ তিথি।

পরবর্তীকালে ব্রাহ্মনেতা শ্রী কৃষ্ণকুমার মিত্র একটি প্রবন্ধে লিখছেন (উদ্বোধন, ৩৮ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৯৩৫), 'পরমহংসদেব প্রতি বৎসর এই উৎসবে আসতেন এবং আনন্দের সহিত উপাসনায় যোগ দিতেন। এই উৎসবে আমি তাঁকে তিন চারবার দেখেছি। তিনি সকালে আসতেন ও সন্ধ্যা পর্যন্ত এখানে থাকতেন।'

এই লেখাটি পড়ে মনে হয় খুব সম্ভবত ১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের আগে অনুষ্ঠিত উৎসবগুলিতে ঠাকুরের সঙ্গে শ্রীম উপস্থিত না থাকায় সেগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়নি।

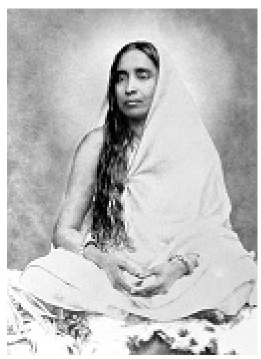
এই বাগান বাড়িতেই ঠাকুরের কাছে তাঁর নামেই নালিশ জানাতে এসেছিলেন তেঁনারা। একবার বেণী পালের বাড়ির উৎসবে এসে ঠাকুর ঠিক করলেন তিনি রাতে আর দক্ষিণেশ্বরে ফিরে যাবেন না। এই বাড়িতেই রাত কাটাবেন। সেবার তাঁর সঙ্গে ছিলেন রাখাল মহারাজ (স্বামী ব্রহ্মানন্দজি মহারাজ)। কিন্তু সেদিন রামকৃষ্ণদেব ও রাখাল মহারাজ ওই বাড়িতে রাত কাটাতে পারেননি। অধিক রাতে ঠাকুর প্রায় জেদাজেদি করে ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে।



এমন কী ঘটনা ঘটেছিল যে ঠাকুর হঠাৎই দক্ষিণেশ্বরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন? সেই রাতের অদ্ভুত সেই ঘটনাটি আমরা শুনব শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর মুখ থেকে। খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' গ্রন্থে। একবার ঠাকুর বেণী পালের বাগানে রাখালকে সঙ্গে করে গেছেন। তিনি বাগানের দিকে বেড়াচ্ছেন। ভূত এসে বলে কি 'তুমি কেন এখানে এসেছ, জ্বলে গেলুম আমরা। তোমার হাওয়া আমাদের সহ্য হচ্ছে না, তুমি চলে যাও, চলে যাও'। তাঁর পবিত্র হাওয়া, তাঁর তেজ ওদের সহ্য হবে কেন? তিনি তো চলে এসে কাউকে কিছু না বলে খাওয়া-দাওয়ার পরেই একখানা গাড়ি ডেকে দিতে বললেন। কথা ছিল—রাতটা ওখানে থাকবেন। তারা বললে, 'এত রাতে গাড়ি কোথায় পাব?'

ঠাকুর বললেন, 'তা পাবে যাও।'

তারা তো গিয়ে গাড়ি আনলে। তিনি রাত্রেই গাড়ি করে চলে এলেন। অত রাত্রে ফটকে গাড়ির শব্দ পেয়ে কান পেতে শুনি—ঠাকুর রাখালের সঙ্গে কথা বলছেন। শুনেই ভাবলুম—'ওমা, কি হবে, যদি না খেয়ে এসে থাকেন, কি খেতে দেবো এই রাতে? অন্যদিন কিছু না কিছু ঘরে রাখতুম, এই সুজি হোক, যাই হোক। কেন না, কখন খেতে চেয়ে বসবেন ঠিক তো ছিল না। তা সেদিন আসবেন না জেনে কিছুই রাখিনি। মন্দিরের ফটক সব বন্ধ হয়ে গেছে, রাত তখন একটা। তিনি হাততালি দিয়ে ঠাকুরের সব নাম করতে লাগলেন। কি করে যেন দরজা খুলিয়ে নিলেন।



আমি বলছি, 'ও যদুর মা (ঝি) কি হবে?' তিনি শুনে বুঝতে পেরে তাঁর ঘর থেকেই ডেকে বলছেন, 'তোমরা ভেবো না গো, আমরা খেয়ে এসেছি।' পরে রাখালকে সেই ভূতের কথা বলতে সে বলছে, 'ও বাবা, তখন বলনি ভালোই করেছ, তা হলে আমার দাঁতকপাটি লেগে যেত। শুনে আমার এখনি ভয় পাচ্ছে।'



ঠাকুর ও গোপালের মা

ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবনে এই একই রকমের ঘটনা ঘটেছিল কামারহাটিতে, তাঁর ভক্ত গোপালের মায়ের বাড়িতে।

'গোপালের মা'! আসল নাম অঘোরমণি দেবী। আনুমানিক ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে কামারহাটির এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাশীনাথ ভট্টাচার্য (ঘোষাল)-এর গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সেই কালের রীতি অনুযায়ী মাত্র ন বছর বয়েসে অঘোরমণির বিয়ে হয় চব্বিশ পরগনা জেলার পাইগহাটী গ্রামের এক পাত্রের সঙ্গে। তখন নিশ্চয়ই পাত্রের বয়স ছিল খুব সম্ভবত পঁচাত্তর বা আশি বছর।

সেই বিয়ের রাতেই মনে হয় অঘোরমণি দেবী তাঁর স্বামীকে প্রথম ও শেষবারের মতো দর্শন করে নিজের নারী জীবন ধন্য করেছিলেন। কারণ মাত্র অল্পকয়েক বছরের বিবাহিত জীবন, এবং এই পুরো সময়টা তিনি তাঁর পিতৃগৃহেই কাটিয়েছেন। তাঁর যখন বয়স মাত্র তেরো বা চোদ্দো বছর সেইসময় খবর এল তাঁর তথাকথিত স্বামী ইহলোকের মায়া কাটিয়ে ওপারে পাড়ি জমিয়েছেন। শুরু হল সেই বালিকার অসহ্য বৈধব্য জীবন। তাঁর বাবা-মা যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন তিনি মস্তক মুণ্ডন করাননি। তাঁরা মারা যাওয়ার পর তিনি পূর্ণ বৈধব্যের বেশ ধারণ করলেন।

স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ তাঁর 'শ্রীরামকৃষ্ণভক্তমালিকা' গ্রন্থে গোপালের মা সম্পর্কে লিখেছেন—'তাঁহার দেহ ছিল কিঞ্চিৎ খর্ব, সুস্থ ,সুগঠিত, বর্ণ ছিল উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ এবং সর্বশরীরে ছিল পবিত্রতার এক অলৌকিক আভা। শ্রীরামকৃষ্ণ অপেক্ষা তিনি প্রায় চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন এবং তাঁহার অন্তর্ধানের পরেও প্রায় বিশ বৎসর জীবিত ছিলেন।'



কামারহাটিতে অঘোরমণি দেবীর বাপের বাড়ির কাছেই ছিল দত্তদের ঠাকুরবাড়ি। কলকাতার পটলডাঙ্গার বাসিন্দা গোবিন্দচন্দ্র দত্তের ঠাকুরবাড়ি। কামারহাটির গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে তিনি মহাসমারোহে সেবাপূজাদি করতেন।

গোবিন্দচন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী পাকাপাকিভাবে ঠাকুরবাড়িতে চলে আসেন। ওই সময়ে বিগ্রহের পুজো করতেন অঘোরমণি দেবীর ভাই নীলমাধব ভট্টাচার্য। সেই কারণেই অল্পদিনের মধ্যে বালবিধবা এই মহিয়সী রমণীর সঙ্গে খুব সুন্দর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল দত্তগৃহিণীর। হয়তো দত্ত গৃহিণীর অনুরোধেই তিনি পিতৃগৃহ ছেড়ে ঠাকুরবাড়ির মহিলামহলের একটি ঘরে থাকতে শুরু করেন। দিনে দু-একবার অবশ্য নিজের বাড়িতে যেতেন।

১৮৮৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসের এক শুভদিন। অঘোরমণি দেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল স্বয়ং ঈশ্বরের। দত্ত গৃহিণীর সঙ্গে তিনিও এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। দেখা হল ভক্ত ও ভগবানের। জীবনটা এবার একদম পালটে যাবে ধর্মপ্রাণা শ্রীকৃষ্ণময় অঘোরমণির। ঠাকুর রামকৃষ্ণের স্নেহস্পর্শে তিনি ধন্য হবেন।

অগ্রহায়ণের সেই শীতের সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার আগে দত্ত গৃহিণী ঠাকুরকে তাঁদের ঠাকুরবাড়িতে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানান। ঠাকুর ঘাড় নেড়ে সম্মতিও জানিয়েছিলেন। রামকৃষ্ণদেব গিয়েছিলেন কামারহাটির দত্তদের ঠাকুরবাড়িতে। সেদিন শ্রীবিগ্রহের সামনে তিনি সংকীর্তন করতে করতে নাচতে শুরু করেন। তারপর প্রসাদ গ্রহণ করে ফিরে আসেন দক্ষিণেশ্বরে।

কিন্তু নিঃসন্তান বালবিধবা অঘোরমণি দেবী কীভাবে 'গোপালের মা' নামে পরিচিত হলেন! সে আর এক অলৌকিক ঘটনা। রামকৃষ্ণদেবের কৃপায় তিনি দর্শন পেলেন গোকুলপতি বাল গোপালের। জ্যান্ত 'বালগোপাল' তাঁর কোলে বসে স্বয়ং লীলা করতেন। মায়ের কোলে চেপে তিনি ঘুরে বেড়াতেন এপাড়া থেকে ওপাড়া, এমনকী দক্ষিণেশ্বর কিংবা বলরাম বসুর বাড়িতেও।

১৮৮৪ সালের বসন্ত কাল। প্রতিদিনের মতো সেদিনও রাত তিনটের সময় উঠে জপে বসেছেন অঘোরমণি দেবী। জপ শেষ করে সবে তিনি প্রাণায়াম শুরু করেছেন ঠিক সেই মুহূর্তে ঘটে গেল সেই অবিস্মরণীয় ঘটনাটি। তিনি দেখলেন তাঁর বাঁদিকে বসে আছেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই ক্ষণের খুব সুন্দর বর্ননা দিয়েছেন স্বামী গম্ভীরানন্দজি।

'এমন সময় দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার বামে উপবিষ্ট, তাঁহার দক্ষিণ হস্তটি মুষ্টিবদ্ধপ্রায় আর মুখে মৃদু হাস্য ঠিক যেমনটি দক্ষিণেশ্বরে দেখিয়াছেন তেমনি। ভাবিলেন, একি! এমন সময়ে ইনি কোথা থেকে কেমন করে এলেন? অবাক হইয়া ভাবিতে ভাবিতে বৃদ্ধা যেমন সাহস করিয়া স্বীয় বাম হস্তে ঠাকুরের বামহস্তটি ধরিলেন, অমনি সে মূর্তি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইল আর তৎস্থলে দর্শন দিল দশ মাসের শিশু সত্যকার গোপাল। সে

হামা দিয়া এক হাত তুলিয়া বৃদ্ধার মুখপানে চাহিয়া বলিল, 'মা ননী দাও।' ব্রাহ্মণী তো দেখিয়া শুনিয়া স্তম্ভিত! এ কি কাণ্ড! তিনি চিৎকার করিয়া কাঁদিয়া বলিলেন, 'বাবা, আমি দুখিনী কাঙালিনী, আমি তোমায় কি খাওয়াব, ননী-ক্ষীর কোথায় পাব বাবা?' সে অদ্ভুত গোপালের কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই—সে খাইবেই। তখন শিকা হইতে নারিকেল নাড়ু দিয়া বলিলেন, 'বাবা গোপাল, আমি তোমাকে এই কদর্য জিনিস খেতে দিলুম বলে আমাকে যেন ওইরূপ খেতে দিও না।'

সকাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি প্রায় আলুথালু বেশে 'গোপাল-গোপাল' বলে ডাকতে ডাকতে দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে হাজির হলেন, তিনি ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুরও সেইসময় তাঁর কোলে উঠে বসলেন। আর তারপর! সাশ্রুনয়নে গোপালের মা সঙ্গে নিয়ে যাওয়া ক্ষীর, সর, ননী গোপালরূপী শ্রীরামকৃষ্ণের মুখে তুলে দিতে লাগলেন। তবে ঠাকুর তাঁকে বলেছিলেন, তোমার এই দর্শনের কথা কাউকে জানিও না। এমনকী আমাকেও না। গোপালের মা অঘোরমণির ঘরেই ঠাকুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল দুই কঙ্কালরূপী প্রেতের।



কামারহাটির দত্ত-ঠাকুরবাড়ির ভূত

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব গোপালের মাকে বলেছিলেন, তুমি তোমার গোপাল দর্শনের কথা কখনও কাউকে বলবে না, এমনকী আমাকেও নয়। তাঁর কথা মতো বৃদ্ধা তারপর থেকে আর কারও সামনে গোপালকে নিয়ে কোনও আলোচনা করতেন না। কিন্তু ঠাকুর একদিন কী করলেন! এখন আমরা সেটাই স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজের মুখ থেকে শুনব। তিনি লিখছেন, 'অশেষ রহস্যময় ঠাকুর একদিন বৃদ্ধাকে কহিলেন, তিনি যেন তাঁহার দর্শনাদির কথা নরেন্দ্রকে বলেন। গোপালের মা প্রশ্ন করিলেন, তাতে কিছু দোষ হবে না তো গোপাল?' ঠাকুর আশ্বাস দিলেন যে, হইবে না। তখন গোপালের মা নরেন্দ্রকে আনুপূর্বিক সমস্ত বলিতে বলিতে মাঝে মাঝে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'বাবা, তোমরা পণ্ডিত বুদ্ধিমান, আমি দুখী কাঙালী কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না। তোমরা বল, আমার এসব তো মিথ্যা নয়?' বৃদ্ধার ভক্তি, প্রেম, ভাবাবস্থা ও দর্শনাদির বিবরণ শুনিতে শুনিতে নরেন্দ্র আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না, তাই সাশ্রুনয়নে উত্তর দিলেন, 'না মা, তুমি যা দেখেছ সব সত্য।'

এই ঘটনাটি ঘটার পরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব একদিন সকাল দশটা নাগাদ রাখাল মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে গোপালের মায়ের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তাঁদের দেখে বৃদ্ধার সে কী আনন্দ। আহ্লাদে প্রায় আটখানা অবস্থা। তিনি জলখাবার তৈরির কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

সেদিন দুজনেই খুব তৃপ্তি করে খেয়েছিলেন। এরপর গোপালের মা ঠাকুর ও রাখাল মহারাজকে তাঁদের বৈঠকখানায় বসিয়ে মেতে উঠলেন দুপুরের খাবার তৈরিতে।



দ্বিপ্রাহরিক আহার শেষ, এবার বিশ্রামের পালা। তারও আয়োজন খুব সুন্দরভাবে করেছিলেন অঘোরমণি দেবী।

তিনি ওই বাড়ির মেয়েমহলের দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে নিজের পরিষ্কার লেপের ওপর সুন্দর একটা চাদর পেতে ঠাকুর ও রাখালমহারাজের বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দিলেন।

সেদিন ঠাকুরের পাশে একই বিছানায় শুয়ে পড়লেন রাখাল মহারাজও। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর প্রবল এক দুর্গন্ধে রামকৃষ্ণদেবের তন্দ্রা ভেঙে গেল। তিনি গন্ধের উৎস খুঁজতে গিয়ে দেখতে পেলেন ঘরের এক কোণে দুটি কঙ্কালসার প্রেতমূর্তি তাঁর দিকে করুণ চোখে তাকিয়ে আছেন। ঠাকুর তাঁদের দিকে তাকান মাত্র তাঁরা অনুনয়ের সুরে বলে উঠলেন, 'আপনি এখানে কেন? আপনি এখান থেকে যান, আপনার দর্শনে আমাদের বড় কষ্ট হচ্ছে।'

দয়ারসাগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সঙ্গে সঙ্গে রাখাল মহারাজকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে নেমে এলেন কামারহাটির রাস্তায়। বিস্মিত রাখাল মহারাজ কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি সেই মুহূর্তে হয়তো হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন গুরুর মুখের দিকে।

ঠাকুর সেদিন গোপালের মাকে এই প্রেত দর্শনের কথা কিছুই জানাননি। কারণ ওই বৃদ্ধাকে তো সেখানেই থাকতে হবে। যদি তিনি সব শুনে ভয় পান। তবে কামারহাটির দত্তদের ঠাকুরবাড়িতে শ্রীশ্রীরাধামাধব ও স্বয়ং গোপাল থাকা সত্ত্বেও যে তাঁরা বহাল তবিয়তে বসবাস করেন তা বোধহয় অঘোরমণি দেবী খুব ভালোভাবেই জানতেন। কারণ ঠাকুর অপ্রকট হওয়ার পর তিনি একবার প্রবল আমাশয়ে আক্রান্ত হন। এটা ১৯০১ সালের কথা। তাঁর সেবার জন্য কন্যাস্থানীয়া এক সেবিকা সেখানে থাকতেন। আর একজন ব্রহ্মচারি তাঁকে হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে যেতেন। এইসময় তাঁকে দেখতে মাঝেমাঝেই স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ), স্বামী সারদানন্দ, সিস্টার নিবেদিতা যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দও একবার গিয়েছিলেন।

সেই সেবিকা যেদিন প্রথম ওই বাড়িতে যান অঘোরমণি তাঁকে দেখেই বলেছিলেন, 'কেন এখানে এলি? কষ্ট পাবি। আমার তো গোপাল আছে। কোথায় শুবি? একটা ঘর ঠিক কর। সব ঘরে চাবি। পূজারি বামুনকে বল একটা খুলে দেবে। দ্যাখ যখন শব্দ-টব্দ পাবি তখন খুব জপ করবি গোড়া থেকেই বাপু বলে রাখছি, এখানে নানান রকম আছে।' সেই রাতটা সেবিকার বড়ই কষ্টে কেটেছিল। ছাদে দুড় দুড় শব্দ, জানলায় আওয়াজ, আর একটা ছমছম ভাব।



তবে দত্তবাড়ির ভূতের উপদ্রবের কথা কারও অজানা ছিল না। তাই গোপালের মা-ও বাইরের কাউকে তাঁদের বাড়িতে রাতে থাকতে বারণ করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের প্রয়াণের খবর শুনে তিনি মাথা ঘুরে পড়ে যান, তাঁর হাত ভেঙে যায়। সেইসময় তাঁর সেবার জন্য এক সেবিকাকে নিয়োগ করা হয়েছিল। অঘোরমণি তাঁকেও চলে যেতে বলেছিলেন।

তাহলে দেখুন সব জেনে শুনেই গোপালের মা তাঁর আদরের গোপালকে বুকে জড়িয়ে ওইরকম এক ভৌতিক বাড়িতে ঈশ্বর ও ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্মরণ করে আমৃত্যু কাটিয়েছিলেন।



তোতাপুরী, ঠাকুর ও পঞ্চবটীর ভৈরব

সাধনজীবন, মানুষ থেকে ঈশ্বরে উত্তীর্ণ হওয়ার সাধনা। এই পথে সাধককে একলা চলতে হলেও তাঁর একটা কম্পাসের দরকার হয়। আর সেই কম্পাসটি হলেন প্রকৃত গুরু। তিনিই শিষ্যকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে পৌঁছে দেন ঈশ্বরের বৈঠকখানায়।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের কাছে মাঝে মাঝেই তাঁর সাধন জীবনের তিনজন গুরুত্বপূর্ণ গুরুর কথা বলতেন। তাঁরা হলেন ১) ব্রাহ্মণী ভৈরবী, ২) তোতাপুরী, ৩) মুসলমান সাধক গোবিন্দ।

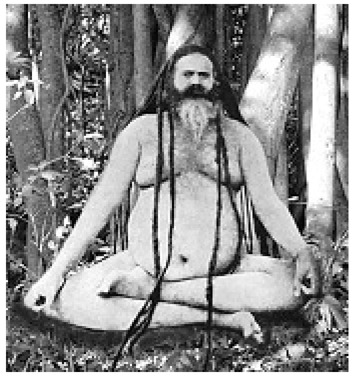
ঠাকুরের দ্বিতীয় গুরু তোতাপুরীর সঙ্গে পঞ্চবটীতে গভীর রাতে দেখা হল এক ভৈরবের। তিনি গাছ থেকে নেমে এসে বসলেন তোতাপুরীর একদম পাশটিতে। তখনও ধুনি জ্বলছে। শুরু হল দুই সাধকের কথপোকথন!

সদা বালক তোতাপুরী মহারাজ সর্বদা উলঙ্গ হয়ে থাকতেন। গুরুর নাম উচ্চারণ করা উচিত নয় বলেই বোধহয় ঠাকুর তাঁকে 'ল্যাংটা' বলে সম্ভাষণ করতেন। তিনি তাঁর গুরু সম্পর্কে বলতেন, 'ল্যাংটা কখনো ঘরের ভিতরে থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন।'

দক্ষিণেশ্বরে তোতাপুরী পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করে অবস্থান করতেন। এবং তাঁর পাশে একটা ধুনি সারাক্ষণই জ্বলত। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা যে কদিন তিনি দক্ষিণেশ্বরে ছিলেন প্রত্যেকে তাঁকে বৃক্ষমূলেই ধুনি সহ দেখেছেন।

সেই রাতে ধ্যানে বসার আগে তোতাপুরী কাকে দেখলেন? তিনি কে ছিলেন? 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ'-তে তার খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে। স্বামী সারদানন্দজি মহারাজ লিখছেন, 'তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভুতুড়ে ঘটনাও বলেন। তাহা এই, গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে বসিবার উপক্রম করিতেছেন জগৎ নীরব নিস্তব্ধ ঝিল্লী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখা সকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘকায় মানবাকৃতি পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। 'ল্যাংটা' নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি?' পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।' ল্যাংটা কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই তুমিও ব্রহ্মের

এক প্রকাশ, আমিও তাই এস, বস, ধ্যান কর।' পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন। ল্যাংটাও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন।'



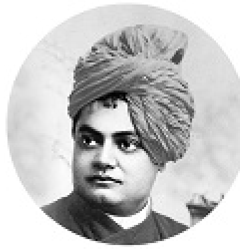
পরদিন সকালে গুরু তোতাপুরী শিষ্য রামকৃষ্ণকে আগের রাতের ভৈরব দর্শনের কথা জানালেন। সব শুনে ঠাকুর বললেন, হ্যাঁ, উনি ওখানে থাকেন বটে। আমিও তাঁর দর্শন কয়েকবার পেয়েছি। ভবিষ্যতে ঘটবে এমন কথাও তিনি আমাকে আগেভাগেই জানিয়েছেন। কোম্পানি বারুদখানার (Powder Magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটা একবার নেবার চেষ্টা করেছিল। আমার তো তাই শুনে খুব ভাবনা শুরু হল। সংসারের কোলাহল থেকে দূরে সরে এসে নির্জন স্থানটিতে বসে মাকে ডাকি সেটাও বোধহয় এবার গেল। মথুর তো রানি রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে। সেইসময় একদিন ওই ভৈরবকে গাছে বসে থাকতে দেখেছিলাম। আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না। মামলায় হেরে যাবে।

মামালায় কোম্পানি গোহারান হেরেছিল।

এই পঞ্চবটীতেই এক রাতে ঠাকুরের ভাগ্নে হৃদয়েরও দারুণ শিক্ষা হয়েছিল। মামার আসনে বসে জপ করার বাসনা জেগেছিল তাঁর মনে। সেইমতো তিনি মামার আসনে ধ্যানে বসলেন। সেইরাতে ঠাকুর যদি পঞ্চবটীতে না আসতেন তাহলে সত্যিই বিপদে পড়তেন হৃদয়।

ওই আসনে বসার পর শুরু হল সমস্যা। মনে হল তাঁর গায়ে কেউ যেন এক মালসা আগুন ঢেলে দিল। সেই রাতে যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে হৃদয় কাতর স্বরে অগতির গতি মামারই শরণাপন্ন হয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ভাগ্নের গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, যা, আর ভয় নেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। কিন্তু তুই কেন এরকম করিস বল দেখি? তোকে তো কতবার বলেছি, আমার সেবা করলেই তোর সব হবে।

স্বামী সারদানন্দজি লিখছেন, 'অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভালো হইবে না।'



স্বামীজি, হরিশ ও উজ্জ্বল মূর্তি

মহামানবের মহাজীবনের চিরপ্রস্থান! জীবনের স্প্যানটা কত দিনের? খুব বেশি কি? মোটেই নয়। তিনি এই পৃথিবীতে আমাদের মধ্যে সশরীরে ছিলেন মাত্র উনচল্লিশ বছর ছ'মাস চব্বিশ দিন। কিন্তু স্বল্পায়ু এই মানুষটি কয়েকটি বছরে লিখে ফেলেছিলেন এক সুবৃহৎ ইতিহাস। তরোয়ালের প্রভূত্ব, স্বৈরাচারি রাষ্ট্রনায়ক, তাঁর অস্ত্রের দম্ভে যা কস্মিনকালেও করতে পারেননি বা পারবেন না, সেই মহামানব গুরু ও গুরুমায়ের আশীর্বাদ এবং স্রেফ নিজের সাধনা, দয়া, মায়া, সেবা দিয়ে জয় করেছিলেন সমগ্র পৃথিবীর মানুষের মন। এই কাজে তাঁর পাশে কে ছিলেন? ছিলেন তাঁর আধুনিক গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, শ্রীমা, তাঁর গুরু ভ্রাতারা, সিস্টার নিবেদিতা ও অল্পকয়েকজন গুণমুগ্ধ ভক্ত মানুষ। তাই তো তিনি আজও আমাদের মনে চির ভাস্বর, চির অমলিন, তিনি আমাদের সিমলে পাড়ার নরেন্দ্রনাথ দত্ত থেকে স্বামী বিবেকানন্দে উত্তীর্ণ হওয়া এক মহামানব। আমাদের বড় আপন জন, বড় কাছের মানুষ। ঠাকুরের কথায় সপ্তঋষির এক ঋষি। সাধক, সেবক স্বামী বিবেকানন্দ।

বজ্রের মতো কঠোর এই মহামানব তাঁর গুরু নির্বাচনের ব্যাপারেও ছিলেন বেজায় খুঁতখুঁতে। রীতিমতো কষ্ঠিপাথরে ঘসে তিনি যাঁকে গুরু হিসেবে বরণ করবেন সেই মানুষটি আদৌ সোনা, না সোনালি রঙের ঝুটাপাথর তা যাচাই করেছিলেন। কঠিন পরীক্ষা দিতে হয়েছিল গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবকে। সেই পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে তারপর তিনি স্থায়ী আসন পেতেছিলেন তাঁর পুত্র ও শিষ্য নরেনের হৃদয়ে।

সাল ১৮৯৫, বিশ্ববিজয়ী স্বামী বিবেকানন্দ সুন্দর একটা চিঠি লিখেছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দজিকে। সেখানে তিনি লিখছেন, 'দাদা, না হয় রামকৃষ্ণ পরমহংস একটা মিছে বস্তুই ছিল, না হয় তাঁর আশ্রিত হওয়া একটা ভুল কর্মই হয়েছে, কিন্তু এখন উপায় কী? একটা জন্ম না হয় বাজেই গেল মরদের বাত কি ফেরে? দশ স্বামী কি হয়? তোমরা যে যার দলে যাও, আমার কোন আপত্তি নাই, বিন্দুমাত্রও নাই, তবে এ দুনিয়া ঘুরে দেখেছি যে, তাঁর ঘর ছাড়া সকল ঘরেই 'ভাবের ঘরে চুরি'। তাঁর জনের উপর আমার একান্ত ভালোবাসা, একান্ত বিশ্বাস। কি করব? একঘেয়ে বলো বলবে, কিন্তু ওইটি আমার আসল কথা। যে তাঁকে আত্মসমর্পণ করেছে, তার পায়ে কাঁটা বিঁধলে আমার হাড়ে লাগে, অন্য সকলকে আমি ভালোবাসি। আমার মতো অসাম্প্রদায়িক জগতে বিরল, কিন্তু ওইটুকু আমার গোঁড়ামি মাফ করবে। তাঁর দোহাই ছাড়া কার দোহাই দেবো? আসছে জন্মে না হয় বড় গুরু দেখা যাবে, এ জন্ম এ শরীর সেই মূর্খ বামুন কিনে নিয়েছে।' অসাধারণ স্বামীজি।

সেই যুক্তিবাদী, কঠোর মনের মানুষ অথচ পরবর্তীকালে গুরু প্রেমে আকূল নরেন্দ্রনাথ দত্তও বাধ্য হয়েছিলেন অলৌকিক ঘটনায় বিশ্বাস করতে। তিনি একবার নয় বহুবার তাঁর গুরু রামকৃষ্ণদেবকে

দেখেছিলেন, বহুজায়গায়। ঠাকুর তখন তো আর আমাদের মধ্যে নেই!

১৬ আগস্ট, ১৮৮৬ সালের রাত একটা দু-মিনিট। আনন্দ শিহরণে ঠাকুরের শরীরে একটা রোমাঞ্চ হল। মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। মহাসমাধিতে লীন হলেন ঠাকুর রামকৃষ্ণপরমহংস দেব। যুগশ্রেষ্ঠ যুগাবতার, স্বয়ং ব্রহ্ম মিশে গেলেন ব্রহ্মে।

ঠাকুরের তিরোধানের একসপ্তাহের মধ্যে উদ্যানবাটীতে একটা আশ্চর্য ব্যাপার ঘটল। সেদিন রাত আটটার সময় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ঠাকুরের আর এক ভক্ত হরিশের সঙ্গে বাটীর পশ্চিমের পুকুরধারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এমনসময় স্বামীজি দেখলেন তাঁর গুরুর মতোই শুভ্র বস্ত্র পরিহিত এক উজ্জ্বল মূর্তি তাঁদের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছেন।

স্বামীজির মতো দৃঢ় মনের মানুষের মনেও সেইমুহূর্তে প্রশ্ন জেগেছিল যিনি এগিয়ে আসছেন তিনি কি সত্যিই ঠাকুর?

তবে তাঁর দিনকয়েক আগেই তো ঠাকুরের দর্শন পেয়েছিলেন শ্রীমা। তিনি যখন হাতের এয়োস্ত্রী চিহ্ন বালা খুলতে গিয়েছিলেন সেইসময় রামকৃষ্ণদেব সশরীরে আর্বিভূত হয়ে তাঁকে বালা খুলে রাখতে নিষেধ করে বলেছিলেন, 'আমি কি মরেছি যে তুমি এয়োস্ত্রীর জিনিস হাত থেকে খুলে ফেলছ।'



যুক্তিবাদী নরেন্দ্রনাথ ভাবতে শুরু করলেন, একবার যিনি আগে এসেছেন, তিনি তাঁর সন্তানদের শোকমুক্ত করার জন্য দ্বিতীয়বার কি আসতে পারেন না! এইসব ভাবতে ভাবতে তিনি তাকিয়ে ছিলেন এগিয়ে আসা সেই উজ্জ্বল মূর্তির দিকে। তবে তাঁর মনে অবশ্যই কিছুটা সংশয় ছিল। তিনি ভেবেছিলেন কাল্পনিক কিছু দেখছি না তো!

এমন সময় হরিশ শ্রীরামকৃষ্ণসদৃশ মূর্তি দেখে কাঁপা গলায় ফিসফিস করে বললেন, 'ও কি? নরেন দেখ দেখ?

এইবার নরেন্দ্রনাথ সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'কে ওখানে?'

বেশ চিৎকার করেই তিনি প্রশ্নটা করেছিলেন। তাঁর গলার আওয়াজে উদ্যানবাটীতে উপস্থিত গুরুভাইরাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে চলে এলেন। কিন্তু তাঁরা কেউই কিছু দেখতে পেলেন না। কারণ, নরেন্দ্রনাথ প্রশ্নটি করা মাত্রই সেই উজ্জ্বল মূর্তি তাঁদের থেকে ঠিক দশ ফুট দূরের এক জুঁই ফুলের ঝোপের কাছে এসে একদম বাতাসে মিলিয়ে গেলেন।

এরপর লণ্ঠন নিয়ে এসে সবাই চারিদিকে তন্নতন্ন করে খুঁজতে শুরু করলেন। কিন্তু সেখানে কাউকেই পাওয়া গেল না।

এইপ্রসঙ্গে 'যুগনায়ক বিবেকানন্দ' গ্রন্থে স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ লিখছেন, 'এই দর্শনটি নরেন্দ্রের অন্তরে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল এবং উপস্থিত সকলের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, ঠাকুর সুক্ষ্মদেহে চিরবিদ্যমান রইয়াছেন। ফলত ইহারও পরে শ্রীমা ও ঠাকুরের কোনো কোনো ভক্ত তাঁহার দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন এবং অনেকে এখনও হইয়া থাকেন।'

এরপর আবার ঠাকুর স্বামীজিকে দর্শন দিলেন গাজিপুরে।



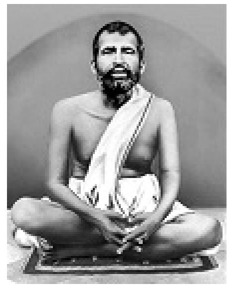
ঠাকুর ও স্বামীজি

গাজিপুরে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার নয় বেশ কয়েকবার তাঁর প্রিয় সন্তান নরেন্দ্রনাথকে দর্শন দিয়েছিলেন। সে এক অলৌকিক দর্শন। গুরুর দুচোখ ভরা অভিমান। সন্তানতুল্য প্রিয় শিষ্যের একী আচরণ! স্বামীজি গাজিপুরে ঠাকুরকে দেখার বহুদিন বাদে 'গাই গীত শুনাতে তোমায়' কবিতার মাধ্যমে পুরো ঘটনাটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন। ছেলেখেলা করি তব সনে,/ কভু ক্রোধ করি তোমা' পরে,/ যেতে চাই দূরে পলাইয়ে/ শিয়রে দাঁড়ায়ে তুমি রেতে,/ নির্বাক আনন, ছল ছল আঁখি,/ চাহ মম মুখ পানে।/ অমনি যে ফিরি, তব পায়ে ধরি,/কিন্তু ক্ষমা নাহি মাগি।/ তুমি নাহি কর রোষ।/ পুত্র তব, অন্য কে সহিবে প্রগলভতা?'

কী ঘটেছিল গাজিপুরে? সেই ঘটনায় যাওয়ার আগে আমাদের একটু বৈদ্যনাথ ধাম, কাশী ও প্রয়াগে যেতেই হবে। সেখান থেকে আমরা যাব গাজিপুরে। ১৮৮৯ সালের ২৬ ডিসেম্বর, মঠ ছেড়ে স্বামীজি আবার পথে নামলেন। বেরোলেন তীর্থপরিক্রমায়। যাবেন বৈদ্যনাথ ধাম। সেখান থেকে তিনি গেলেন কাশীতে। বিশ্বেশ্বরের স্থান ও অন্নপূর্ণার ধামে থাকাকালীন স্বামীজি খবর পেলেন স্বামী যোগানন্দ (যোগেন্দ্র) প্রয়াগে জলবসন্ত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। স্বামীজি তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছলেন। তবে যোগানন্দজি অল্পদিনের মধ্যে সুস্থ হয়ে ওঠায় স্বামী বিবেকানন্দের সুযোগ হল স্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার। এইসময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় এক মুসলমান ভদ্রলোকের। স্বামী গম্ভীরানন্দ মহারাজ লিখছেন, 'যাঁহার মুখের প্রতিটি রেখা বুঝাইয়া দিতেছিল যে, তিনি পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হয়েছেন।'

এই প্রয়াগে থাকাকালীন স্বামীজি আবার পওহারী বাবাজির নাম শুনলেন। প্রথম শুনেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। এইবার বাবাজিকে দর্শন করার ইচ্ছা তাঁর প্রবলতর হয়ে উঠল। ১৮৯০ সালের ২২ জানুয়ারি স্বামীজি গাজিপুরে পৌঁছলেন।

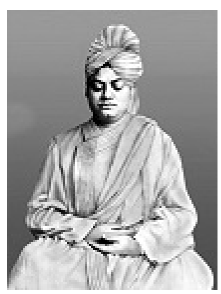
কাশীর কাছের এক গ্রামের অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মন বংশে পওহারী বাবা জন্মগ্রহণ করেন। স্বামীজি যখন গাজিপুরে পৌঁছলেন সেইসময় বাবাজি দিনের প্রায় বেশিরভাগ সময় গুহামধ্যে কাটাতেন। এবং রাতে নদীর ওপারে গিয়ে তপস্যায় বসতেন। বাবাজি খুবই স্বল্পাহারী ছিলেন। তাঁর তখনকার আহার ছিল একমুঠো নিমপাতা ও গোটাকয়েক লঙ্কা। এইকারণেই স্থানীয় মানুষজন তাঁকে পওহারী (পবন-আহারী) নামে ডাকতেন।



বাবাজির দর্শন পাওয়া মোটেই সহজসাধ্য ছিল না। তিনি যে গুহায় বসে সাধনা করতেন তার ওপরে একটা কুটির ছিল। কেউ কথা বলতে চাইলে তিনি ওই কুটিরে উঠে এসে বন্ধ দরজার ওপার থেকে কথা বলতেন। স্বামীজিও তাঁর দর্শন খুব সহজে পাননি। বহু চেষ্টার পর তিনি সফল হন।

৪ ফেব্রুয়ারি স্বামীজি প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে চিঠিতে লিখছেন, 'বহু ভাগ্যফলে বাবাজির সাক্ষাৎ হইয়াছি। ইনি অতি মহাপুরুষ—বিচিত্র ব্যাপার এবং এই নাস্তিকতার দিনে ভক্তি এবং যোগের অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার অদ্ভুত নিদর্শন। আমি তাঁহার শরণাগত হইয়াছি, আমাকে আশ্বাসও দিয়াছেন, সকলের ভাগ্যে ঘটেনা। বাবাজির ইচ্ছা কয়েক দিবস এইস্থানে থাকি, তিনি উপকার করিবেন। অতএব এই মহাপুরুষের আজ্ঞানুসারে দিন কয়েক এ স্থানে থাকিব।' ('বাণী ও রচনা')

স্বামীজি গাজিপুরে থাকাকালীন আবারও অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া পওহারী বাবাকে নিয়ে এত মাতামাতি তাঁর কয়েকজন গুরুভাই পছন্দ করছিলেন না। কিন্তু স্বামীজি সবকিছু উপেক্ষা করেই গাজিপুরে থেকে গেলেন। কারণ রাজযোগী, মিষ্টভাষী, বৈষ্ণবভাবাপন্ন বাবাজি তাঁকে আশ্বাস দিয়ে থাকতে বলেছিলেন।



স্বামীজি সেইসময় পওহারী বাবাজির কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য উদগ্রীব। স্বামীজির তখনকার মনের অবস্থা খুব সুন্দর তুলে ধরেছেন স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ। তিনি লিখছেন, 'বাবাজি যখন স্বামীজিকে রাজযোগ শিক্ষা দিতে এবং স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার তাঁহার সম্মুখে খুলিয়া ধরিতে সম্মত হইতেছিলেন না, তখন একদা স্বামীজি ভাবিলেন, হয়তো বা বাবাজির নিকট দীক্ষা লইলে পথ সুগম হইতে পারে। পূর্ণতর জ্ঞানলাভের আকাঙ্ক্ষা তখন তাঁহার মনে এতই প্রবল যে, ওই জন্য তাঁহার নিকট কিছুই অসাধ্য ছিলনা। সঙ্কল্প যখন স্থির হইয়া গেল এবং পরদিনই দীক্ষাগ্রহণের জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন।'

পরদিন স্বামীজি দীক্ষা নেবেন পওহারী বাবাজির কাছে। শুধুমাত্র রাতটা কাটার অপেক্ষা। সেই রাতে তিনি ঘরে শুয়ে সেইসব কথাই ভাবছিলেন। এমনসময় তাঁর ঘরটি দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত হয়ে উঠল, আর স্বামীজি দেখলেন, তাঁর চিরপ্রেমিক আধুনিক গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং সশরীরে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। ঠাকুরের মুখে কোনও কথা নেই। সস্নেহ অথচ বেদনাভরা তাঁর ছলছল দুটি আঁখি প্রিয় শিষ্যের চোখের ওপরই নিবদ্ধ।

স্বামীজি কী করলেন। তখন তাঁর মুখে কোনও ভাষা নেই। সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। শুরু হল কম্পন। স্বামীজি কাঁপছেন। ভয়ে নয়, আত্মগ্লানিতে। স্বামীজি সেদিন শুধু কাঁদেননি, তাঁর মনে আত্মগ্লানি জেগেছিল। তিনি দীক্ষা নেবেন না বলে ঠিক করলেন। দীক্ষার দিন স্থগিত থাকল। তবু স্বামীজির মনের দ্বন্দ্ব দূর হল না। দিন দুয়েক বাদে স্বামীজির মন আবার বাবাজির কাছে দীক্ষা নেওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। এবারও দর্শন দিলেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ। তবে সেই রাতে এমন কিছু ঘটেছিল যা স্বামীজি কখনও কারও কাছে প্রকাশ করেননি। এইরকম পাঁচ-ছয়বার দর্শন পাওয়ার পর স্বামীজির মন থেকে দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছা চিরতরে হারিয়ে গেল। তাঁর হৃদয়ে ঠাকুর ছাড়া কারও প্রবেশের অবকাশ আর থাকল না।

স্বামীজি আবার ঠাকুরকে দেখলেন। অদ্ভুত, অলৌকিক সে ঘটনা। বিশ্বজয়ে বেরোবেন স্বামী বিবেকানন্দ। সেই যাত্রার ফল ও প্রয়োজন সম্পর্কে তাঁর মনে তখন কোনও দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অনিশ্চয়তা বোধটা কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য তিনি ঈশ্বরনির্দেশের অপেক্ষায় রইলেন।

তারপর কী ঘটল? স্বামীজি অর্ধনিদ্রিত অবস্থায় শুয়ে আছেন। এমন সময়ে স্বপ্নে তিনি সেই নির্দেশ পেলেন। দেখলেন, বিস্তৃত মহাসাগরের একূল থেকে তাঁর গুরু, পিতা শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্রে নামলেন, তারপর হাঁটতে হাঁটতে চললেন ওপারের দিকে। এবং ইঙ্গিতে অনুসরণ করতে বললেন পুত্র নরেন্দ্রনাথকে।

তন্দ্রা ভেঙে গেল স্বামীজির। অনাবিল শান্তিতে তাঁর মন ভরে উঠল। তাঁর কানে বাজতে লাগল এক অশরীরী বাণী 'যাও'।

সেই অলৌকিক দর্শনকে স্বামীজি ভগবানের নির্দেশ বলেই মেনে নিলেন।



বুদ্ধদেব ও স্বামীজি

স্বামী বিবেকানন্দ বরাবরই ধ্যান করতে খুব ভালোবাসতেন। গভীর ধ্যান। সময় সুযোগ পেলেই তিনি ধ্যানে বসে পড়তেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উৎসাহে তাঁর ধ্যানে-রুচি আরও বেড়ে গিয়েছিল। একদিন সবে ধ্যান শেষ হয়েছে, তখনও তিনি আসনে বসে আছেন, ধ্যানের ঝোঁক ও আনন্দের রেশে আচ্ছন্ন। ঠিক এমন সময় তাঁর দিব্যদর্শন হল। দিব্যজ্যোতিতে ঘর পূর্ণ হয়ে গেল। একজন অপূর্ব সন্ন্যাসী দক্ষিণ দিকের দেওয়াল ভেদ করে ঘরে প্রবেশ করলেন। স্বামীজির থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন। অপূর্ব তাঁর চেহারা। পরনে গৈরিক বসন, হাতে কমণ্ডুলু, মুখে প্রশান্তির ছাপ। সববিষয়ে উদাসীনতার কারণে একটা অন্তর্মুখী ভাব।

স্বামীজি তাঁর দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। আর সেই সন্ন্যাসীও তাঁকে কিছু বলার জন্য তাঁর দিকে এগোতে শুরু করলেন। স্বামীজি সেদিন কেমন যেন ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি দ্রুত আসন থেকে উঠে পড়ে দরজা খুলে ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তবে পরমহূর্তে তাঁর মনে প্রবল অনুশোচনা জেগেছিল। কাজটা যে ঠিক হয়নি তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। মনে মনে ভেবেছিলেন, সন্ন্যাসী কী বলতে চাইছিলেন সেটা শোনাটাই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ হত। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আবার ঘরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীকে আর দেখতে পেলেন না। ওইপ্রসঙ্গে পরবর্তীকালে স্বামীজি বলতেন, এমন অপূর্ব সন্ন্যাসী আমি আর কখনও দেখিনি। কী সৌম্য সুন্দর তাঁর মুখের ভাব। স্বামীজির মনে বিশ্বাস জন্মেছিল তিনি সেদিন বুদ্ধদেবের দর্শন পেয়েছিলেন।

মাদ্রাজে মন্মথবাবুর বাড়িতে থাকার সময় স্বামীজি বাধ্য হয়েছিলেন এক পিশাচসিদ্ধের কাছে যেতে। তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর মা ভুবনেশ্বরী দেবী দেহত্যাগ করেছেন। ঘুমটা ভেঙে গেল। এই স্বপ্ন দেখে তাঁর মন খুব খারাপ হয়েছিল।

বিষণ্ণ বিবেকানন্দ। তাঁকে ওই অবস্থায় চুপ করে বসে থাকতে দেখে মন্মথবাবু প্রথমে কলকাতায় তার করলেন, তারপর স্বামীজিকে বললেন,আপনি আমার সঙ্গে চলুন। শহরের বাইরে এক পিশাচসিদ্ধ ব্যক্তি থাকেন। তিনি মানুষের শুভাশুভ, ভূত-ভবিষ্যৎ বলে দিতে পারেন। আপনি চলুন তাঁর কাছে।

মন্মথবাবুর অনুরোধ ও নিজের মানসিক অবস্থার কারণেই স্বামীজি বোধহয় সেদিন পিশাচসিদ্ধের কাছে যেতে রাজি হয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে মন্মথবাবু ছাড়া ছিলেন আলাসিঙ্গা ও আর একজন। খুব সম্ভবত ইন্ডিয়া ব্যাঙ্কের ম্যানেজার বালাজি রাও।

কিছুটা রেলে এবং বাকি পথ পায়ে হেঁটে তাঁরা নির্দিষ্ট শ্মশানে গিয়ে পৌঁছলেন। স্বামী গম্ভীরানন্দজি লিখছেন, 'শ্মশানের পাশে বিকটাকার, শুঁটকো, ভুষকালো একটা লোক বসিয়া আছে। তাহার অনুচররা স্থানীয় ভাষায় পিশাচসিদ্ধের পরিচয় করাইয়া দিল। আলাসিঙ্গা দোভাষীর কাজ করিলেন।'

পিশাচসিদ্ধ স্বামীজি ও তাঁর সঙ্গীদের একদম আমল দিতে চাইলেন না। বিরক্ত স্বামীজি ও তাঁর সঙ্গীরা যখন ফিরে আসছেন তখন পিশাচসিদ্ধ তাঁদের দাঁড়াতে বললেন। এবং একটা পেনসিল নিয়ে অনেকক্ষণ নানা দাগ-টাগ কেটে, মনস্থির করে একাগ্রচিত্তে স্থির হয়ে বসে রইলেন। তারপর প্রথমে স্বামীজির নাম, গোত্র ও চৌদ্দপুরুষের খবর দিয়ে বললেন, ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব আপনার সঙ্গে সবসময় আছেন। আপনাকে খুব শিগগিরিই ধর্মপ্রচারের জন্য বহু দূর দেশে যেতে হবে। আপনার মাকে নিয়ে কোনও চিন্তা করবেন না, তিনি খুব ভালো আছেন।

মাদ্রাজে ফিরে এসেই স্বামীজি মায়ের সুস্থ থাকার খবর পেলেন।

এই পিশাচসিদ্ধের নাম ছিল গোবিন্দ চেট্টি। শোনা যায় আমেরিকা জয় করে ফিরে আসার পর স্বামীজির সঙ্গে আবার ওই পিশাচসিদ্ধের দেখা হয়েছিল। কুম্ভমেলায় দেখা হওয়ার পর স্বামীজি তাঁকে বুকে টেনে নেন। এরফলে পিশাচসিদ্ধ গোবিন্দ চেট্টির সমস্ত সিদ্ধাই লোপ পায়। তারমধ্যে জেগে উঠে ঈশ্বরকে পাবার আকুতি। ('বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ' প্রথম খণ্ড)



মাদ্রাজে থাকাকালীন প্রেতাত্মাদের উৎপীড়নে স্বামীজি খুবই ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়েছিলেন। তাঁরা একসময় স্বামীজিকে প্রচণ্ড বিব্রত করতে শুরু করলেন। তাঁরা মাঝেমাঝেই নানা ধরনের খবর তাঁকে দিতেন। সেইসব খবর শুনে বা পেয়ে তিনি খুবই উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হয়ে পড়তেন। পরে দেখা যেত সেগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, সঠিক নয়।

ভূতেদের কাণ্ডকারখানায় তিতিবিরক্ত স্বামী বিবেকানন্দ একদিন ভীষণই রেগে গেলেন। ক্রুদ্ধ স্বামীজিকে শান্ত করার জন্য তাঁরা বললেন, আমরা বড় কষ্টে আছি। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন। স্বামীজি তাঁদের উদ্ধারের জন্য অনেক ভেবে চিন্তে একটা উপায় বের করলেন। তিনি সমুদ্রতীরে গেলেন। তাঁর কাছে পিণ্ড দেওয়ার জন্য চাল, তিল, কুশ কিছুই ছিল না। তাই তিনি মুঠো মুঠো বালি দিয়ে পিণ্ডদান করলেন। তারপর থেকেই বন্ধ হল ভৌতিক উপদ্রব।



আলমোড়ায় ভূতে ধরা মানুষকে সুস্থ করলেন স্বামীজি

কাঠগোদাম থেকে আলমোড়ায় এলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথমেই তাঁর সঙ্গে দেখা হল স্বামী অখণ্ডানন্দের। তিনি ক্লান্ত স্বামীজিকে অম্বাদত্তের বাগানে বসিয়ে খবর দিতে গেলেন তাঁদের অপর দুই গুরুভ্রাতা স্বামী সারদানন্দ ও কৃপানন্দকে। এই দুই গুরুভ্রাতা তার দিনকয়েক আগেই আলমোড়ায় এসে পৌঁচেছেন।

স্বামীজি এসেছেন শুনে তাঁরা দ্রুত পায়ে অম্বাদত্তের বাগানের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু মাঝ রাস্তাতেই তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল স্বামীজির। সেইসময় তাঁরা থাকতেন লালা বদ্রীসার বাড়িতে। স্বামীজিকেও তাঁরা তাঁদের আশ্রয়দাতার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বদ্রীসাও স্বামীজিকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন।

সময়টা নিয়ে একটা মতান্তর আছে ঠিকই। তবে এই আলমোড়াতেই স্বামীজি একটা ভৌতিক ঘটনার সাক্ষী হয়েছিলেন। আসলে সংশয় শুধু সময় নিয়ে। তবে এই ঘটনার কথা স্বামীজি নিজের মুখেই আমাদের জানিয়ে গেছেন। সম্ভবত এইবার নয়, আমেরিকা থেকে ফেরার পর তিনি যখন দ্বিতীয়বার আলমোড়াতে যান তখন এই ঘটনাটি ঘটেছিল। প্রথমবার না দ্বিতীয়বার কোন সময়ে ঘটনাটি ঘটেছিল তা নিয়ে অহেতুক জলঘোলা না করে আসল প্রসঙ্গে এবার প্রবেশ করা যাক।

একদিন সবাই মিলে বদ্রীসার বাড়িতে বসে নানারকম আলোচনা করছেন। এমনসময় গ্রামের মধ্যে প্রবল জোরে মাদল বাজতে শুরু করল। সবাই খুব আশ্চর্য হলেন। এমনসময় স্থানীয় এক মানুষ প্রায় ছুটতে ছুটতে লালা বদ্রীসার বাড়িতে এসে বললেন, 'মহাশয়, আপনি এখনিই আমার সঙ্গে চলুন। একজনকে ভূতে ধরেছে।'

বদ্রীসা যখন বেরোবার জন্য প্রস্তুত সেইসময় শুধুমাত্র কৌতূহল মেটাবার জন্য স্বামীজি তাঁর সঙ্গী হতে চাইলেন। বদ্রীসাও সানন্দে রাজি হয়ে গেলেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে তাঁরা দেখলেন, যে মানুষটিকে ভূতে ধরেছে তিনি মাটিতে শুয়ে যন্ত্রনায় ছটফট করছেন। এবং কয়েকজন মানুষ তাঁর হাত-পা চেপে ধরে আছেন। আর একজন ব্যক্তি হয় তিনি পুরোহিত বা রোজা ভূত তাড়াবার জন্য অনর্গল মন্ত্রপাঠ করছেন ও মাঝে-মাঝে একটি অগ্নিবর্ণ উত্তপ্ত কুঠার অগ্নিকুণ্ড থেকে তুলে আক্রান্ত ব্যক্তির শরীরের বিভিন্ন স্থানে এমনকী চুলেও চেপে ধরছিলেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, উত্তপ্ত কুঠার দিয়ে তাঁর শরীরের বিভিন্ন স্থান এমনকী চুল স্পর্শ করা হলেও কোনও স্থান পুড়ছিল না বা ফোসকা পড়ছিল না।

এইরকম অস্বাভাবিক ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে স্বামীজি খুবই অবাক হয়েছিলেন। তিনি ভিড় ঠেলে একদম সামনের সারিতে চলে এলেন। গৈরিকবস্ত্রধারী স্বামীজিকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে সরে দাঁড়ালেন এবং বললেন, মহারাজ, আপনি দয়া করে এই লোকটিকে সুস্থ করে দিন।

গৈরিকবস্ত্রধারী সন্ন্যাসী মানেই প্রভূত শক্তির অধিকারী সেই ধারণা থেকেই হয়তো তাঁরা এইরকম অনুরোধ করেছিলেন। স্বামীজিও মনে হয় তখন যথেষ্ট বিব্রত হয়েছিলেন, কারণ সত্যি মানুষটিকে ভূতে ধরেছিল কিনা তা দেখার জন্যই তিনি বদ্রীসার সঙ্গী হয়েছিলেন। বলা যেতে পারে তিনি স্রেফ তাঁর কৌতূহল নিবারণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কখনও ভাবেননি যে তাঁকে রোজা বা ওঝা হয়ে ভূত তাড়াতে হবে।



স্বামীজি একসময় গ্রামবাসীদের অনুরোধ আর এড়াতে পারলেন না। তিনি ভূতে ধরা মানুষটির পাশে গিয়ে বসে প্রথমেই কী করলেন? কুঠারটা আদৌ গরম কিনা তা পরীক্ষা করতে চাইলেন। সেইসময় কুঠারটি প্রায় স্বাভাবিক বর্ণ ধারন করেছে। তিনি কুঠারের ফলায় হাত ঠেকানো মাত্র তাঁর হাত পুড়ে গেল। শুরু হল প্রবল জ্বালা ও যন্ত্রণা। ভূত তাড়াবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা আর তাঁর মধ্যে অবশিষ্ট রইল না। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তিনি তাঁর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করেই সেই ব্যক্তির মাথার ওপর হাত রেখে একমনে নিজের ইষ্টমন্ত্র জপ করতে শুরু করলেন। আশ্চর্যের বিষয়, দশ-বারো মিনিটের মধ্যেই মানুষটিকে দেখে অনেকটাই সুস্থ মনে হল।

এবং কিছুক্ষণ বাদে তিনি সম্পূর্ণ শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে গেলেন।

পরবর্তীকালে স্বামীজি এই ঘটনা সম্পর্কে বলেছিলেন, 'তারপর আমার উপর গাঁয়ের লোকের ভক্তি দেখে কে! আমায় একটা কেষ্ট-বিষ্টু ঠাওরালে। আমি কিন্তু ব্যাপারখানার কিছুই বুঝতে পারলুম না। অগ্যতা বিনা বাক্যব্যয়ে আশ্রয়দাতার সঙ্গে তাঁর কুটিরে ফিরে এলুম। তখন রাত প্রায় ১২টা। এসেই শুয়ে পড়লুম বটে, কিন্তু হাতের জ্বালায় আর ওই ব্যাপারের রহস্য-উদ্ভেদের চিন্তায় সমস্ত রাত্রি ঘুম হল না। জ্বলন্ত কুঠারে মানুষের শরীর দগ্ধ করতে পারলে না দেখে কেবলই মনে হতে লাগল, 'There are more things in heaven and earth than are dreamt of on your philosophy' পৃথিবীতে ও স্বর্গে এমন অনেক ব্যাপার আছে যার সন্ধান দর্শন শাস্ত্রে মেলে না।'



প্রাণে বাঁচলেন স্বামী বিবেকানন্দ

হৃষীকেশে স্বামীজি। সঙ্গে বেশ কয়েকজন গুরুভাইও রয়েছেন। আশ্রয় পেয়েছেন সাধু ধনুরাজ গিরির বাড়িতে। আহার জুটছে স্রেফ ভিক্ষে করে। মাধুকরী বৃত্তি অবলম্বন করেই দিন কাটাচ্ছেন তাঁরা। এইসময় স্বামীজি ঠিক করলেন তিনি কঠোর সাধনায় বসবেন। শুরু হল তাঁর সাধনা। কিন্তু এবারও তাঁর বাসনা পূর্ণ হল না। তিনি অসুস্থ হলেন। জ্বর আর কমতেই চায় না। গুরুভাইরাও স্বামীজির জন্য খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

প্রবল জ্বর, অবস্থা ক্রমেই জটিল হয়ে উঠল। একদিন শুরু হল প্রবল ঘাম, তারপর শরীরটা একদম ঠান্ডা হয়ে গেল। নাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মাটিতে পাতা দুটো কম্বলের ওপর অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন বিশ্বপ্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ। দেখে সবারই মনে হয়েছিল তাঁর বোধহয় শেষসময় উপস্থিত।

গুরুভাইরা অসহায় অবস্থায় তাঁকে ঘিরে বসে আছেন। কারণ কাছে-পিঠে কোনও ডাক্তার, কবিরাজ বা চিকিৎসার বিন্দুমাত্র সুযোগসুবিধা ছিল না। তাঁরা একান্ত মনে মধুসূদনকে ডাকতে শুরু করলেন। আর ঠিক সেইসময় তাঁদের কানে এল একটা পদশব্দ। ঘাড় ঘুরিয়ে তাঁরা দেখলেন দরজার ঠিক বাইরে এক সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁকে সাদরে ঘরে প্রবেশ করার অনুরোধ জানালেন তাঁরা।

সাধু ঘরে ঢুকে স্বামীজির কী হয়েছে জানতে চাইলেন। গুরুভ্রাতারা তাঁকে সব কিছু জানানো মাত্র তিনি তাঁর ঝোলা থেকে মধুর শিশি ও পিপূল চূর্ণ বের করে খলে মেড়ে স্বামীজিকে খাইয়ে দিলেন। ওষুধটি যেন অমৃতের মতো কাজ করল। কিছুক্ষণের মধ্যে স্বামীজি চোখ মেলে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন। একজন গুরুভাই তাঁর মুখের কাছে কানটা নিয়ে যাওয়া মাত্র তিনি ক্ষীণস্বরে কিছু বললেনও।

পরবর্তীকালে স্বামীজি তাঁর সঙ্গীদের বলেছিলেন, অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকার সময় দেখলাম, যে জগতে আমাকে বিধাতার একটা বিশেষ কাজ করতে হবে। এবং সেই কাজ যতদিন না শেষ হয় ততদিন আমার বিশ্রাম বা শান্তি নেই।

এই ঘটনার পর থেকে তাঁর গুরুভাইরা স্বামীজির মধ্যে একটা বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তির স্ফুরণ লক্ষ করেন। এবং সেই শক্তির বেগ এতটাই প্রবল ছিল যে তা স্বামীজির শরীরে বদ্ধ অবস্থায় থাকতে চাইছিল না। তিনিও অবশ্য সেই শক্তিকে কাজে লাগাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

স্বামীজি এবার হায়দরাবাদে। খবর পেলেন এক সিদ্ধ যোগীর। পণ্ডিত ওই মানুষটি ছিলেন জাতিতে ব্রাহ্মণ। সংসার ত্যাগ করে দীর্ঘদিন যোগভ্যাসের ফলে তিনি বহু যোগবিভূতির অধিকারী হয়েছিলেন।

স্বামীজি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে একদিন সেই যোগীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন যোগী জ্বরে শয্যাশায়ী। তবুও স্বামীজিকে দেখে তিনি শয্যা থেকে উঠে তাঁকে তাঁর পাশে বসতে বললেন। আসলে স্বামীজির

দেহলক্ষণ দেখে যোগী বুঝতে পেরেছিলেন, সন্ন্যাসী উচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন। কথা বলতে বলতে তিনি স্বামীজিকে বললেন, আপনি আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করুন তাতেই আমার জ্বর সেরে যাবে।

সত্যিই জ্বর সারে কিনা তা দেখার জন্য তিনি যোগীর মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। যোগীর জ্বর কমে গেল। তিনি বিছানায় উঠে বসলেন। তখন স্বামীজি তাঁকে বললেন, আমাকে আপনার সিদ্ধাই দেখাতে হবে। যোগী রাজি হলেন। তাঁর নির্দেশমতো স্বামীজি ও অন্যরা যোগীর পোশাক খুলে নিয়ে নিজেদের একটা কম্বল দিয়ে শরীর ঢেকে দিলেন।

যোগী ঘরের এক কোণে গিয়ে বসলেন, এবং সবার নজর তখন তাঁর ওপর। যোগী বললেন, আপনারা যে যা চান তা কাগজে লিখে আমার হাতে দিন। ওই অঞ্চলে যে সমস্ত ফল পাওয়া যায়না তাঁরা সেইসব ফলের নাম লিখে যোগীর হাতে তুলে দিলেন। তারপরই ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনাটি। সেই সিদ্ধ যোগী প্রত্যেকের ফরমাশ মতো টাটকা ফল তাঁর কম্বলের মধ্যে থেকে বের করতে শুরু করলেন। একটাসময় ঘরে এত ফল জমে গেল যে তা ওজন করলে অবশ্যই যোগীর শরীরের ওজনের দুগুণ তো হবেই।



যোগী এরপর তাঁদের ফল খেতে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কেউই সেই ফল খেতে রাজি হচ্ছেন না দেখে তিনি নিজেই খেতে শুরু করেন। তাঁর দেখাদেখি সবাই ফলাহারে ব্যস্ত হলেন। ফলগুলি সত্যিই খুব সুস্বাদু ও টাটকা ছিল। ফলাহারের পর সেই যোগী তাঁর কম্বলের ভিতর থেকে একরাশ গোলাপ ফুল বের করে আনলেন। প্রত্যেকটি ফুলই নিঁখুত ও তখনও ফুলের পাঁপড়িতে শিশির লেগে আছে। এটা কী করে সম্ভব হল তা যোগীর কাছে জানতে চেয়েছিলেন স্বামীজি। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'সবই হাত সাফাই এর ব্যাপার।'

স্বামী গম্ভীরানন্দজি মহারাজ লিখছেন, ক্যালিফর্নিয়ায় 'মনের শক্তি' বিষয়ক বত্তৃ«তা প্রদানকালে স্বামীজি স্বয়ং এই ঘটনাটি বিবৃত করেন। ওই বত্তৃ«তাকালে তিনি আর একজন মনশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তির কথা বলিয়াছিলেন, যিনি অপরের মনের কথা বলিয়া দিতে পারিতেন, মনে মনে কোন প্রশ্ন ভাবিয়া তাঁহার নিকট গেলে প্রশ্ন না শুনিয়াও উত্তর বলিয়া দিতেন, ওই ব্যক্তির নিকট গেলে তিনি একখণ্ড কাগজে কিছু লিখিয়া উহা ভাঁজ করিয়া স্বামীজির হাতে দিলেন এবং স্বামীজিকে বলিলেন, তিনি যেন মোড়কটির ওপর সহি করিয়া পকেটে রাখিয়া দেন, যথাকালে খুলিতে বলিলে খুলিবেন। উপস্থিত অপর সকলকেও তিনি অনুরূপ কাগজ দিলেন, এবং ওইভাবেই রাখিয়া দিতে বলিলেন।

অবশেষে বলিলেন, আপনারা যে-কোনও ভাষায় চিন্তা করুন। স্বামীজি সংস্কৃতে চিন্তা করিলেন, ওই ব্যক্তি সংস্কৃত জানিতেন না। কথা ভাবিবার পর ওই ব্যক্তি স্বামীজিকে বলিলেন, পকেটের কাগজ খুলিয়া দেখুন। স্বামীজি দেখিলেন, তিনি ওইক্ষণে যে কথা ভাবিলেন, ওই ব্যক্তি পূর্ব হইতেই উহা জানিয়া লইয়া লিখিয়া

রাখিয়াছেন। অপরদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ মিলিয়া গেল বহু অজানা ভাষাণও তাঁহারাও ভাবিয়াছিলেন, কিন্তু ওই ব্যক্তি পূর্ব হইতেই সব জানিয়া রাখিয়াছিলেন।'



স্বামীজি বলতেন, 'আমি কখনো চল্লিশ পেরুব না'

ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন, 'এই যে আমার নরেন, কেমন চুপচাপ বসে আছে। চওড়া বুক, শক্ত পেশি, চোখদুটো আকাশের মতো কিন্তু অন্তর্মুখী। ও আমাকে চিনতে পেরেছে কিনা জানি না! কিন্তু আমি চিনেছি। ও একটি তরোয়াল। মায়ের শক্তিতে ঝলমল করছে। আমি খাপটা কেড়ে নিয়েছি, ওই খাপখোলা তরোয়াল বিশ্ব জয় করবে। তারপর আমার কাজ শেষ হলে ওটি আবার ঢুকে যাবে খাপের মধ্যে। এমন কজন আছে রে! সবই তো থ্যাসথেসে ফলার। ওই একমাত্র ফোঁস করা সাপ, জাতসাপ, গোখরো। তবে যেদিন নরেন নিজেকে চিনতে পারবে সেদিনই সে ফিরে যাবে অনন্তে। আমিই তো তাকে ডেকে এনেছিলুম।'

স্বামী বিবেকানন্দ এখন মুক্তির চিন্তা করছেন। স্বামী চেতনানন্দজি লিখছেন, 'জীবনসায়াহ্নে স্বামীজি বিদায়সঙ্গীত গাইতে শুরু করলেন। ১৮৯৭ সালে স্বামীজি পাশ্চাত্যে বেদান্ত ও শ্রীরামকৃষ্ণের মহান বাণী প্রচার করে ভারতে ফিরলেন। তিনবছর ধরে পাশ্চাত্যবাসীদের 'কালরাত্রি মোহরাত্রি' ভাঙিয়ে নিজের শরীরটা ভেঙে ফেললেন। আমেরিকায় থাকতেই তিনি গাইতে শুরু করলেন 'My play is done O Mother, break my chains and make me free.' ১৮৯৮ সালের ৪ জুলাই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে কাশ্মীরে লিখলেন সেই বিখ্যাত কবিতা 'To the Fourth of July'। কে জানে তখনি তিনি ওই দিনটি নিজের মহাপ্রয়াণের জন্য নির্দিষ্ট করেছিলেন কিনা?'

স্বামীজি তখন কাশ্মীরে। সেখানে বসে তিনি আমেরিকার স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে একটি উৎসব করলেন। গুরুর আদেশে সঙ্গে থাকা বিদেশিনী শিষ্যারা তৈরি করলেন আমেরিকার পতাকা। সিস্টার নিবেদিতাও তাঁদের সঙ্গে ছিলেন। স্বামীজি লিখলেন সেই বিখ্যাত কবিতাটি 'To the Fourth of July' 'Behold, the dark clouds melt away—

That gathered thick at night, and hung
So like a gloomy pall above the earth!
Before thy magic touch, the world
Awakes. The birds in chorus sing.
The flowers raise their star-like crowns
Dew—set, and wave thee welcome fair.
The lakes are opening wide in love
Their hundred thousand lotus-eyes

To welcome thee, with all their depth.
All hail to thee, thou Lord of Light!
A welcome new to thee, today,
O Sun! Today thou sheddest Liberty!
Bethink thee how the world did wait,
And search for thee, through time and clime.
Some gave up home and love of friends,
And went in quest of thee, self-banished,
Through dreary oceans, through primeval forests,
Each step a struggle for their life or death,
Then came the day when work bore fruit,
And worship, love, and sacrifice,
Fulfilled, accepted, and complete.
Then thou, propitious, rose to shed
The light of Freedom on mankind.
Move on, O Lor, in thy resistless path!
Till thy high noon o'erspreads the world.
Till every land reflects thy light,
Till men and women, with uplifted head,
Behold their shackles broken, and
Know, in springing joy, their life renewed!'

এই কাশ্মীরেই ঘটেছিল আর এক অলৌকিক ঘটনা। একদিন ডাল লেকের নৌকা থেকে স্বামীজি হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সাত-আট দিন পরে বিদেশিনীরা দেখলেন, ফিরে এসেছেন অন্য এক স্বামীজি। তিনি গিয়েছিলেন, ক্ষীর ভবানী-তে। নিবেদিতাকে বললেন, মা আমাকে সব বলে দিলেন (ঠাকুরের সেই কথা নরেন যেদিন নিজেকে চিনতে পারবে)। মা আমার মাথায় চেপে বসেছেন। আমার শেষ দিন আমি জেনে গেছি। স্বামীজি লিখলেন, 'Kali the Mother' বা মৃত্যুরূপা মাতা। এই কবিতাটি আবৃত্তি করতে করতে তিনি বলতেন,'এর প্রত্যেকটা কথা সত্য। আর আমি তা কাজেও প্রমাণ করেছি, দেখ আমি মৃত্যুকে বরণ করেছি।'

অসাধারণ এক কবিতা। 'Kali the Mother', পরবর্তীকালে যার বঙ্গানুবাদ করেছিলেন কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত।

স্বামীজি লিখেছিলেন—

'The stars are blotted out—
The clouds are covering clouds,
It is darkness vibrant, sonant.
In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics
Just loose from the prison—house,
Wrenching trees by the roots,
Sweeping all from the path.
The sea has joined the fray,

And swirls up mountain—waves,
To reach the pitchy sky.
The flash of lurid light
Reveals on every side
A thousand, thousand shades
Of Death begrimed and black
Scattering plagues and sorrows,
Dancing mad with joy,
Come, Mother, come!
For Terror is Thy name,
Death is in Thy breath,
And every shaking step
Destroys a world for e'er.
Thou 'Time', the All-Destroyer!
Come, O Mother, come!
Who dares misery love,
And hug the form of Death,
Dance in Destruction's dance,
To him the Mother comes.'

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত কবিতাটির বঙ্গানুবাদ করলেন এইভাবে—

'নিঃশেষে নিভেছে তারাদল, মেঘ এসে আবরিছে মেঘ,/ স্পন্দিত ধ্বনিত অন্ধকার, গরজিছে ঘূর্ণ-বায়ুবেগ!/ লক্ষ লক্ষ উন্মাদ পরাণ, বহির্গত বন্দিশালা হতে,/মহাবৃক্ষ সমূলে উপাড়ি' ফুৎকারে উড়ায়ে চলে পথে!/ সমুদ্র সংগ্রামে দিল হানা, উঠে ঢেউ গিরিচূড়া জিনি'/ নভস্থলে পরশিতে চায়! ঘোররূপা হাসিছে দামিনী,/ প্রকাশিছে দিকে দিকে তার মৃত্যুর কালিমা মাখা গায়,/ লক্ষ লক্ষ ছায়ার শরীর! দুঃখরাশি জগতে ছড়ায়,/ নাচে তারা উন্মাদ তান্ডবে মৃত্যুরূপা মা আমার আয়!/ করালি! করাল তোর নাম, মৃত্যু তোর নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে/ তোর ভীম চরণ-নিক্ষেপ প্রতিপদে ব্রহ্মাণ্ড বিনাশে!/ কালী, তুই প্রলয়রূপিনী, আয় মা গো আয় মোর পাশে।/ সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়, মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,/ কাল-নৃত্য করে উপভোগ, মাতৃরূপা তারি কাছে আসে।'

স্বামীজি তখন খুবই অসুস্থ। কাশ্মীরে থাকাকালীন তাঁর শরীর আবারও খারাপ হল। একটু সুস্থ হওয়ার পর একদিন তিনি দু-খণ্ড পাথর হাতে তুলে নিয়ে সিস্টার নিবেদিতাকে বললেন, 'যখনি মৃত্যু আমার কাছে আসে, আমার সব দুর্বলতা চলে যায়। তখন আমার ভয় বা সন্দেহ বা বাহ্যজগতের চিন্তা—এসব কিছুই থাকে না। আমি শুধু নিজেকে মৃত্যুর জন্য তৈরি করতে থাকি। তখন আমি এইরকম শক্ত হয়ে যাই (পাথরদুটিকে পরস্পর ঠুকে) কারণ, আমি ভগবানের পাদস্পর্শ করেছি।'



১৮৯৯ সালে স্বামীজি আবার বিদেশে গেলেন। সেইসময় স্বামী অভেদানন্দজি নিউইয়র্কে রয়েছেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজি তাঁকে বললেন, 'দেখ ভাই! আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে—বড় জোর আর তিন চার বছর বাঁচব।'

অভেদানন্দজি মৃদু আপত্তি জানিয়ে বললেন, 'অমন কথা বলতে নেই স্বামীজি। তোমার তো দ্রুত স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে। তাছাড়া আমাদের যে এখনো অনেক কাজ বাকি—এ তো সবে শুরু।'

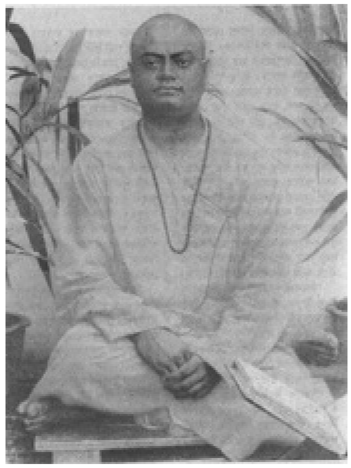
অভেদানন্দজির কথা খুব মন দিয়ে শুনে স্বামীজি সেই অসাধারণ কথাটি বললেন, 'আমার কথা বুঝতে পারছ না ভাই! আমার অনুভব হচ্ছে, আমি যেন বেজায় বেড়ে যাচ্ছি। আমার অন্তর এত বেড়ে যাচ্ছে যে সময়ে সময়ে মনে হয়, এ শরীরে তাকে এঁটে রাখা সম্ভব হবে না। আমি প্রায় ফেটে যাবার মতো হয়েছি। এই হাড়মাংসের খাঁচা আমাকে নিশ্চয়ই আর বেশিদিন ধরে রাখতে পারবে না।'

স্বামীজির এইসময়কার কথাবার্তা শুনলে বা চিঠি পড়লে বোঝা যায় তিনি তখন মুক্তি পাবার জন্য ছটফট করছেন। হাড়মাংসের খাঁচা থেকে মুক্ত হয়ে তিনি প্রকৃতির বুকে স্বাধীন পাখির মতো উড়তে চাইছেন। ১৯০০ সালের, ১৮ এপ্রিল, স্বামীজি মিস ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখলেন, 'এখন পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে সেই মহান মুক্তিদাতার অপেক্ষায় যাত্রা করে বসে আছি। 'অব শিব পার করো মেরা নেইয়া।'...বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে। রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর সে গভীর আহ্বান। যাই, প্রভু যাই! ওই তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুক, তুই আমার পিছু পিছু চলে আয়।' যাই, প্রভু যাই।'

এর কয়েকমাস বাদে, স্বামীজি তখন প্যারিসে। সেখান থেকে তিনি ক্রিস্টিনকে লিখলেন, তারিখ ১৪ অক্টোবর। স্বামীজি লিখছেন, 'গাছের শাখায় ঘুমন্ত পাখি রাত পোহালে যেমন জেগে উঠে গান করে, আর উড়ে যায় গভীর নীলাকাশে—ঠিক তেমনিভাবেই আমার জীবনের শেষ।...আমি পেয়ে গিয়েছি আমার লক্ষ্যকে। আমি যে মুক্তার সন্ধানে জীবনসমুদ্রে ডুব দিয়েছিলাম, তা তুলে আনতে পেরেছি।'

এই প্রসঙ্গে স্বামী চেতনানন্দজি লিখছেন, 'মানুষ মৃত্যুকে ভয় পায়। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞের কাছে জীবন ও মৃত্যু মায়ার খেলামাত্র। আত্মার জন্মও নেই, মরণও নেই। দেহের জন্ম ও মরণ ব্রহ্মজ্ঞকে ব্যথা বা শোক দিতে পারে না। মৃত্যুকে কি করে ভালোবাসা যায় স্বামীজি তা শেখাতে চেয়েছিলেন 'কাউন্ট অফ রিশিলু'কে। পরবর্তী কালে কাউন্ট তাঁর স্মৃতিচারণ করেন এবং শচীন্দ্র মজুমদার (পরবর্তী কালে স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দ) তাঁর গীতাবিষয়ক গ্রন্থে তা লিপিবদ্ধ করেন।'

সাল ১৯৫১, নিউইয়র্কের রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ স্বামী নিখিলানন্দ কাউন্ট আরমণ্ড ডি রিশিলুকে মধ্যাহ্ন ভোজে নিমন্ত্রণ করেন। সেই ভোজ সভায় স্বামী ব্রহ্মময়ানন্দজি উপস্থিত ছিলেন। কাউন্ট ছিলেন ফ্রান্সের কার্ডিনাল রিশিলুর বংশধর।



১৯৫১ সালে কাউন্টের বয়স ছিল প্রায় আশি বছর। সঙ্গে ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্ত্রী। তিনি ছিলেন রিশিলুর থেকে অনেকটাই ছোট। সেদিন মধ্যাহ্ন ভোজের পর কাউন্ট কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, স্বামীজি যখন প্যারিসে, তখন আমি নিয়মিতভাবে তাঁর ক্লাস করতাম। স্বামীজির ক্লাসে আমি সবসময় পিছনের সারিতে বসতাম যাতে কেউ আমাকে দেখতে না পায়। একদিন ক্লাস শেষ হবার পর আমি যেমন প্রতিদিনের মতো পিছনের দরজা দিয়ে চুপচাপ বেরিয়ে যেতাম, সেইভাবেই বেরোচ্ছি। এমনসময় স্বামীজি আমার সামনে উপস্থিত হয়ে হাত ধরে বললেন, আমি লক্ষ্য করেছি, তুমি আমার ক্লাসে নিয়মিত আস। তুমি যদি চাও তোমাকে আমি একটা জিনিস দিতে পারি।

আমি বলেছিলাম, কী জিনিস স্বামীজি?

তিনি বললেন, মৃত্যুকে কী করে ভালোবাসা যায় তা তোমাকে শেখাতে পারি।

আমি সেদিন উত্তরে স্বামীজিকে বলেছিলাম, মৃত্যুকে ভালোবাসা! আমার কী প্রয়োজন তাকে ভালোবেসে! আমার যৌবন আছে, স্বাস্থ্য আছে, আর আছে অতুল ঐশ্বর্য। আমি জীবনটাকে উপভোগ করতে চাই। মৃত্যুকে ভালোবেসে আমার কী লাভ? আমার কথা শুনে স্বামীজি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে কেবল বলেছিলেন, আমার কথা তুমি একদিন বুঝবে এবং মৃত্যুকেও ভালোবাসতে চাইবে।

শচীন্দ্র মজুমদার লিখছেন, 'কাউন্ট তারপর আমাদের বললেন যে, পরে (তিনি স্বামীজির সংস্পর্শে আসেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে) তিনি বুঝতে পারেন—স্বামীজি কী শেখাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হায়! স্বামীজি চলে গেছেন। অপূর্ব সুযোগ হারিয়েছেন তিনি।'

স্বামীজি বিদেশে মৃত্যুবরণ করতে চাননি। তাই তিনি দেশে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। দ্বিতীয়বার ভারতে ফেরার পথে কায়রোতে ম্যাডাম কালভেকে তিনি বলেছিলেন, 'আমি মরবার জন্য শীঘ্র ভারতে ফিরে যেতে চাই এবং আমার গুরুভাইদের সঙ্গে থাকতে চাই।'

স্বামীজির কথা শুনে, ম্যাডাম সেদিন বলেছিলেন, 'সে কি স্বামীজি? আপনি কেন মরবেন? আপনাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন।'

আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামীজি মায়াবতী গেলেন। প্রবল শীতকে উপেক্ষা করেই তিনি গিয়েছিলেন সদ্য স্বামীহারা মিসেস সেভিয়ারকে সান্ত্বনা দিতে। সেখানে কয়েকদিন কাটিয়ে তিনি ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। এরপর তিনি মা ও দিদিমাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণে বেরোবেন। যাবেন পূর্ববঙ্গ ও আসামে।



৪ঠা জুলাই ১৯০২

মিসেস সেভিয়ারের সঙ্গে দেখা করে স্বামীজি ফিরে এলেন বেলুড় মঠে। সেইসময় তাঁর শরীর একদম ভালো ছিল না। তিনি তখন মুক্তির আকাশে মুক্ত বিহঙ্গের মতো ওড়ার জন্য ছটফট করছেন। একদিন তিনি তাঁর গুরুভ্রাতাদের বললেন, দেখ আমি তো মায়ের জন্য কখনও কিছু করলুম না আমার শরীরের যেরকম অবস্থা তাতে দু-এক বছরের বেশি বাঁচব বলে মনে হয় না। তাই আমার ইচ্ছা মাকে কিছু তীর্থ করাই। তাহলে তবু তাঁর কিছু করা হবে। তা তোমরা যদি আমায় এ বিষয়ে সাহায্য কর তো ভালো হয় আমার নিজের শরীরের তো এই অবস্থা।

এরপরই মা-দিদিমা ও দু-একজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে নিয়ে স্বামীজি তীর্থভ্রমণে বেরোলেন। তাঁরা যাবেন পূর্ববঙ্গ ও আসামের দিকে। শিলং-এ পৌঁছে স্বামীজি আবার অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শুরু হল প্রবল শ্বাসকষ্ট। এক ফোঁটা বাতাসের জন্য তিনি তখন ছটফট করছেন। গুরু ভ্রাতারা স্বামীজির অবস্থা দেখে অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। ভয়ানক শ্বাসকষ্ট উপেক্ষা করেই স্বামীজি তাঁদের বলেছিলেন, 'যাক, মৃত্যুই যদি হয়, তাতেই বা কি আসে যায়? যা দিয়ে গেলুম, দেড়হাজার বছরের খোরাক।'

এই তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে বেশ কয়েকটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। একদিন ভুবনেশ্বরী দেবী তাঁর জগৎবিখ্যাত পুত্র স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন, 'দেখ এসব তো অনেক হল, বেশ ভালো, এইবার একটা বিয়ে কর।' উত্তরে স্বামীজি বলেছিলেন, 'দেখো মা, বিয়ে করবার কি দরকার? এই দেখনা আমার সব কত বড় বড় ছেলে (শিষ্যদের দেখিয়ে) রয়েছে।' কিন্তু এই বিয়ের প্রসঙ্গ দিদিমা তুললেই, স্বামীজি মজা করে হাসতে হাসতে বলতেন, 'দেখ দিদিমা, এখনও আমার হাতে কিছু টাকা আছে তুমি এই বেলা মর, আমি তোমার বেশ ঘটা করে শ্রাদ্ধ করি।'

একজন জন্মসন্ন্যাসী, ঠাকুর যাঁকে এই বলে বিশ্বাস করতেন, যে এই মহাপ্রাণটি জগতের হিতের জন্যে অবতীর্ণ হয়েছেন অনন্তের পরিমণ্ডল থেকে। ঠাকুর এও জানতেন তাঁর এই ধ্রুব শিষ্যটির শরীর বেশি দিন থাকবে না। স্বামীজিও সেকথা জানতেন কিন্তু তিনি সাধারণ পরিবেশে, সাধারণের মতো সাধারণ। তখন তাঁর কোনও অহঙ্কারই থাকত না। সাধারণের সঙ্গে সাধারণের মতোই নিজের বৃহৎকে গুটিয়ে আনতেন। রঙ্গ রসিকতা, মেয়েলি কথাবার্তাতেও তাঁর আপত্তি ছিল না। এখানে তিনি পবিত্র এক অস্তিত্বকে বহন করে নিয়ে চলেছেন—তাঁর গর্ভধারিণীকে। এই পরিক্রমা বৃত্তাকারে ফিরে আসবে উৎসে। আর সেইখান থেকেই ঘটবে তাঁর আবার ফিরে যাওয়া অনন্তে।

তিনি যে চলে যাবেন এই তথ্যটি তিনি নিজের মধ্যে সঙ্গোপনে রেখে দিয়েছিলেন। কেউ যেন বুঝতে না পারে, অগ্নিনির্বাপিত হতে চলেছে। ঘটনাটি এত আকস্মিক যে তাঁর ঘনিষ্ঠ গুরুভ্রাতারাও বুঝতে পারেননি।

সেইদিন তিনি দেখিয়ে গেলেন তাঁর লীলা। সম্পূর্ণ সুস্থ সেদিন। একমাইলেরও অধিক পথ হেঁটে এলেন। তারপর নিঃশব্দে নিজের শক্তি দিয়ে যেন জ্বালালেন আর একটি বৃহৎ হোমকুণ্ড, আহুতি দিলেন নিজেকে।

ঠাকুর বলতেন, যাবার আগে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব। অর্থাৎ আমি কে, সাধারণ ও অসাধারণ মানুষ উভয়েই বুঝতে পারবে। তাঁরই প্রধান শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ সিমুলিয়ার 'বিলেটি' কে, তা অগ্নিআখরে আকাশের গায়ে লিখে রেখে যাবেন। সেই কারণেই প্রথম দিনেই শেষদিনের কথা বলার চেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বড় সুন্দর একটা লাইন রেখে গেছেন 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে।' স্বামীজির শেষ কোথায়! তিনি তো অনন্ত, তিনি তো ব্রহ্মস্বরূপ। তিনি বলতেন অহং ব্রহ্মাস্মি। হাজার বার বললেও, ব্রহ্মস্বরূপ হওয়া যায় না।

স্বামীজি আবার বলতেন ব্রহ্মের আবার অসুখ কী? শ্বাস কষ্ট, মধুমেহ এসবই তো শরীরের। ঠাকুর যাকে বলতেন খাঁচা। ঠাকুরও তো বলতেন, রোগ জানুক আর দেহ জানুক। আমেরিকা ভ্রমণের শেষের দিকে স্বামীজি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন কিন্তু পাত্তা দেননি। পূর্ববঙ্গ ভ্রমণের সময় শরীর সহযোগিতা করেনি। তিনি সেসব গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেননি। পরিব্রাজক অবস্থায় হৃষীকেশে গুরুভাইরা মনে করেছিলেন তিনি দেহ ছেড়ে দিয়েছেন। বরাহনগর মঠে একবার ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। স্বামীজির অসুখ করে না, কারণ তিনি মুহূর্তে নিজেকে দেহাতীত অবস্থায় নিয়ে যেতে পারেন। তাঁর শেষের দিনটি স্পষ্ট করে দিয়ে গেছে দেহ নয় তিনি ছিলেন একটি অগ্নিশিখা। পাশ্চাত্যের পাদরিরাও বারে-বারে সে প্রমাণ পেয়েছিলেন।



ফিরে আসি শেষ দিনটির কথায়। সেদিন তিনি ভীষণ সুস্থ। ঠাকুরও চলে যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে তাঁর সেবকদের বড় আনন্দ দিয়েছিলেন। সুস্থ মানুষের মতো গলা অন্ন সহজে গ্রহণ করে (স্বামীজিই খাইয়ে দিয়েছিলেন) বড় আরামে বালিশে মাথা রেখে শুয়েছিলেন। আনন্দের হিল্লোল বয়ে গিয়েছিল।

শেষদিনে স্বামীজি কী করলেন! যেটিকে বলা যেতে পারে একটু অন্যরকম। রুদ্ধদ্বার ঠাকুর ঘরে দীর্ঘক্ষণ ধ্যানে বসে রইলেন। তারপর বারান্দায় পায়চারি করতে করতে একটি গান বারে বারে গাইলেন। বিকেলে ভ্রমণ শেষে তিনি তাঁর নিজের ঘরে মেঝেতে শুয়ে পড়লেন, সেবককে বললেন বাইরে থাক। সেবক বাইরে থেকে একসময় একটি আর্ত কণ্ঠস্বর শুনলেন। এসে দেখলেন স্বামীজি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। এখানেই শেষ নয়, তিনি তাঁর দেহের বাইরে বিচরণ করছিলেন। তা না-হলে তিনি নিবেদিতার প্রার্থনা কেমন করে শুনতে পেলেন। সিস্টার একটি স্মারক নিজের কাছে রাখতে চাইছিলেন। অগ্নি সমন্বিত একটি বস্ত্রখণ্ড পূতচিতাগ্নি থেকে উড়ে এসে তাঁর শরীর স্পর্শ করল। বিদেশিনী স্তম্ভিত। কে কী বুঝলেন জানা নেই, তাঁর এই মানস কন্যা হয়তো রবীন্দ্রনাথের এই লাইনটির অর্থ আর একবার বুঝলেন এনেছিলে সাথে করে মৃত্যুহীন প্রাণ...।



বাবাজি মহারাজ ও যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী

'জ্ঞানগঞ্জ'! চির রহস্যময় এক অলৌকিক স্থান। প্রকৃত সাধকদের কাছে এই স্থানটি অত্যন্ত লোভনীয় ও কাঙ্ক্ষিত ভূমি। তবে কারও ইচ্ছা হল আর সেখানে বেড়াতে বা সাধনা করতে চলে গেলেন ব্যাপারটি মোটেই সেরকম নয়। সেখানে যেতে হলে সাধকের ইচ্ছা নয়, গুরুত্ব পায় জ্ঞানগঞ্জে বসবাসকারী কোনও মহাপুরুষের আমন্ত্রণ। তিনি বা তাঁরা না নিয়ে গেলে সেই স্থান সাধারণ মানুষের কাছে চির অগম্য হয়েই থেকে যায়। মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজজি মহাশয় তাঁর 'জ্ঞানগঞ্জ' গ্রন্থে এই স্থানটি সম্পর্কে লিখছেন, 'সিদ্ধভূমি অনেক আছে—শাস্ত্র পাঠে তাদের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং কোন কোন শক্তিশালী মহাত্মা নিজের জীবনে ওই সম্বন্ধে কিছু কিছু প্রত্যক্ষ অনুভবও প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কথিত আছে, যে জ্ঞানগঞ্জ আমাদের এই পরিচিত পৃথিবীর একটি গুপ্ত স্থান বিশেষ কিন্তু উহা এমন গুপ্ত যে বিশিষ্ট শক্তির বিকাশ না হইলে এবং ওই স্থানের অধিষ্ঠাতার অনুজ্ঞা না হইলে এই মর্ত্যজীবের দৃষ্টিগোচর হয় না। সিদ্ধভূমি মাত্রেরই ইহাই বৈশিষ্ট্য।'

জ্ঞানগঞ্জের প্রধান কার্যালয় যেখানে সেই জায়গাটির নাম 'মনোহর তীর্থ'। অত্যন্ত দুর্গম একটি স্থান, কিন্তু অতি রমণীয়। জ্ঞানগঞ্জের অন্যান্য পরমহংসদেবের গুরুদেব ব্রহ্মর্ষি 'মহাতপা'-র আসন এই তীর্থে। এখানে সিদ্ধ মহাপুরুষরা যেমন থাকেন সেইরকম সিদ্ধ ভৈরবীদেরও স্থান। শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ পরমহংসদেব কয়েকজনের নাম করতেন, উমা ভৈরবী, ত্রিপুরা ভৈরবী, খ্যাপা ভৈরবী। তিনি যখন দেহে ছিলেন তখন খ্যাপা ভৈরবীর বয়স বারোশো বছর। মনোহর তীর্থের সঙ্গে অন্যান্য জ্ঞানগঞ্জের যোগাযোগ হত আকাশপথে, যোগবিভূতি মার্গে। এখানে রোগ-শোকের কোনও অস্তিত্ব নেই, ফলে মৃত্যুও নেই। বিশুদ্ধানন্দজি যে শাখার কথা প্রায়ই বলতেন সেটি পাঞ্জাবের জলন্ধর থেকে গোগা পর্যন্ত বিস্তৃত।

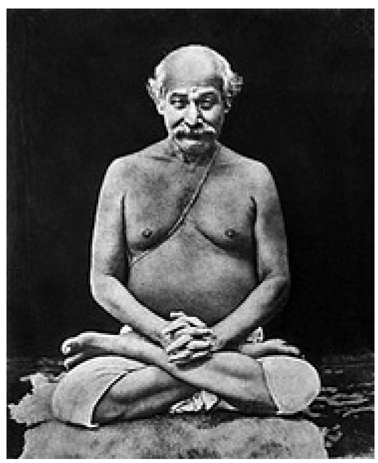
কেন এখানে জ্ঞানগঞ্জের প্রসঙ্গ এল! যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের গুরু বাবাজি মহারাজ সূক্ষ্মশরীরেই সর্বত্র বিচরণ করতেন। তাঁর সঙ্গে জ্ঞানগঞ্জের নিয়মিত যোগাযোগ ছিল বললে ভুল বলা হবে, বরঞ্চ বলা যেতে পারে তিনি ওই মহাতীর্থেই বসবাস করতেন। এবং গুরুর কৃপায় লাহিড়ী মহাশয়েরও সৌভাগ্য হয়েছিল ওই তীর্থে সাধনা করার।

সে এক মহা অলৌকিক ঘটনা। ১৮৬১ সালের কথা। সেইসময় হিমালয়ের রানিখেত অঞ্চলে সেনাবিভাগের প্রয়োজনে একটি সেনানিবাস তৈরির কাজ শুরু হয়েছে। এই সামরিক পূর্তবিভাগে চাকরি করতেন তরুণ এক বাঙালি। তাঁর নাম শ্যামাচরণ লাহিড়ী। তিনি তখন দানাপুরে কর্মরত। একদিন একটা আর্জেন্ট টেলিগ্রাম এল তাঁর কাছে। অবিলম্বে তাঁকে দানাপুরের পাট গুছিয়ে যেতে হবে রানিখেতে। কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, লাহিড়ী মশাই রওনা হলেন পাঁচশো মাইল দূরের রানিখেতে। কাজে যোগ দিলেন তিনি।

কাজ এমন কিছু নয়। সকালের দিকে কাজের চাপ একটু বেশি থাকে। তারপর অখণ্ড অবসর। ফাঁকা সময়ে তিনি জমিয়ে গল্প করেন কুলি, মজুর, ডাকবিভাগের পিওন প্রভৃতি মানুষের সঙ্গে। আর দু-চোখ ভরে উপভোগ করেন নাগাধিরাজ হিমালয় পর্বতের অসীম সৌন্দর্য। কখনও কখনও হারিয়ে যান কল্পনার রাজত্বে, ভাবেন এই নাগাধিরাজের কত শত গুহায় আজও কঠোর সাধনায় ব্যস্ত আছেন কত তাপস।

লাহিড়ী মহাশয় স্থানীয় মানুষের মুখে হিমালয়ের নানা অলৌকিক কাহিনি ও অসংখ্য জনশ্রুতি শুনেছেন। জেনেছেন দূরের দ্রোণগিরি শিবকল্পতাপসদের বিচরণভূমি। তাঁদের কৃপালীলায় অনেকে যে ধন্য হয়েছেন সে খবরও তাঁর কানে এসেছে। তিনি একদিন পাহাড় দর্শনে বেরোবেন বলে ঠিক করলেন। সেইমতো এক বিকেলে তিনি বেরিয়ে পড়লেন।

এই ঘটনার খুব সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন স্বয়ং গোপীনাথ কবিরাজজি। তাঁর মুখ থেকেই সেই বিকেলে ঘটে যাওয়া অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনি আমরা শুনব, 'রাণীক্ষেত হইতে চীরগাছের ঘন বন। অদূরে দুর্গম পাহাড়ের সারি পরপর উঁচু হইয়া গিয়াছে, ঊর্ধ্বে নীলাকাশের মহাশূন্যে। পাকদণ্ডির আঁকাবাঁকা বনপথ দিয়া চলিতে চলিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। সম্মুখেই চোখ পড়ে নন্দাদেবীর গিরিচূড়ায় অস্তরাগের অপরূপ সমারোহ। দূরে দিকচক্রবালে চিরতুষারমণ্ডিত পর্বতশৃঙ্গের তরঙ্গমালায় ছড়াইয়া পড়ে তাহার বর্ণচ্ছটা। দেবাদিদেব ধূর্জটির তামাভ্র জটাজালে যেন দিগন্ত ঢাকিয়া গিয়াছে।



আত্মবিস্মৃত তরুণ এ মহিমময় দৃশ্যের দিকে চাহিয়া আছেন! অকস্মাৎ নির্জন দ্রোণগিরি কম্পিত করিয়া ধ্বনিত হইল 'শ্যামাচরণ! শ্যামাচরণ লাহিড়ী'!'

চমকে উঠেছিলেন লাহিড়ী মহাশয়। তিনি থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। ভাবতে শুরু করলেন এই তো দিনকয়েক আগে জরুরি তার পেয়ে দানাপুর থেকে এখানে এসেছি। কারও সঙ্গে তেমন আলাপ-পরিচয় হয়নি। তাহলে এই নির্জন পাহাড়ে আমার নাম ধরে কে ডাকছেন! তিনি আমার নাম জানলেন কীভাবে?

ভয় ও কৌতূহল দুটোই জেগে উঠেছিল তাঁর মনে। কণ্ঠস্বর অনুসরণ করে বেশ খানিকটা যাওয়ার পর তিনি দেখতে পেলেন, কিছুটা দূরে এক পর্বত গুহার মুখে যেন তাঁরই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন তেজপুঞ্জকলেবর, জটাজুট সমন্বিত এক যোগী সন্ন্যাসী।

সন্ন্যাসীর মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠেছিলেন শ্যামাচরণ লাহিড়ী। যোগীর চোখদুটো আনন্দে ঝলমল করছে। তিনি শ্যামাচরণের খুব কাছে এসে নরম সুরে বললেন 'শ্যামাচরণ অব তুম আগয়া! ব্যয়েঠ যাও বিশ্রাম কর লো। ম্যায়হী তুমহে পুকার রহা থা!'

এবার আর ভয় নয়, শঙ্কা ও সন্দেহের দোলাচালে আটকে গেলেন লাহিড়ী মহাশয়। তিনি নানা কথা ভাবতে শুরু করলেন, বহু প্রশ্ন তাঁর মনে এসে ভিড় জমাল। তিনি চিন্তায় পড়ে গেলেন, তাই তো, এই সাধু আমার নাম কী করে জানলেন? হয়তো কোনও পিওন বা পাহারাদারের কাছ থেকে আমার নামটা জেনেছেন। এইসব ভাবতে ভাবতেই তিনি অবশ্য যোগীকে একটা নিয়মরক্ষার প্রণাম করতে ভোলেননি।

সেই সন্ধ্যায় শ্যামাচরণ লাহিড়ীর জন্য অনেক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিল। প্রণাম করে মাথা তোলা মাত্রই যোগী হাসতে হাসতে অবলীলায় শ্যামাচরণের পিতৃপুরুষের নাম-ধাম, পরিচয় সবকিছুই এক নিশ্বাসে বলে দিলেন। তারপর বললেন, তুমি বৃথাই আমাকে সন্দেহ করছ। মনে রেখ আমি তোমার নিতান্ত আপনজন। তোমার অপেক্ষাতেই এতদিন এই দুর্গম গিরিশিখরে বসে আছি। এই পাহাড়ে এর আগে কখনও এসেছ কিনা তা একবার মনে করার চেষ্টা কর তো!

না! কিছুই মনে করতে পারলেন না শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়।



যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা হল তাঁর পূর্বজন্মের গুরুর

শ্যামাচরণ লাহিড়ীর সঙ্গে দেখা করার জন্য দ্রোণগিরি পর্বতের গুহা মুখে যে সাধক দাঁড়িয়ে ছিলেন, তিনি আর কেউ নন, তিনিই বাবাজি মহারাজ। তিনি কোনও একদিন এক মাতার গর্ভ থেকে ভূমিষ্ট হয়েছিলেন ঠিকই। তারপর সবটাই অলৌকিক। তিনি জয় করেছিলেন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, মৃত্যু সহ এই পৃথিবীর আরও অন্যান্য নিয়মকে। ঈশ্বর ও সময়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে তিনি হয়েছিলেন অমর। আজও হয়তো কোনও 'প্রকৃত শিষ্য' হিমালয়ের কোনও গুহাকন্দরে তাঁর দর্শন পেয়ে ধন্য করেন তাঁর মনুষ্য জীবন। থাক সে কথা।

১৮৬১ সালের সেই গোধূলি বেলায় বাবাজি মহারাজ কী করলেন? তিনি তরুণ শ্যামাচরণ লাহিড়ীর হাত ধরে নিয়ে গেলেন গুহার ভেতরে। স্বল্পালোকেও শ্যামাচরণ দেখতে পেলেন সেই গুহার এককোণে পড়ে আছে কোনও সাধুর ব্যবহৃত বাঘছাল, ধুনি, দণ্ড ও কমণ্ডলু।

বিস্মিত শ্যামাচরণ! তাঁর চমক ভাঙল সেই রহস্যময় যোগীর কণ্ঠস্বরে। তিনি অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, 'দেখ তো, এগুলো চিনতে পারছ কিনা! এসব তো তোমারই জিনিস! তুমি ফেলে গিয়েছিলে। সেসব কথা তোমার কি এতটুকু মনে পড়ছে না?'

হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন শ্যামাচরণ লাহিড়ী। তিনি কিছুই মনে করতে পারছিলেন না। অসহায় শ্যামাচরণের দিকে তিনি তখন বাড়িয়ে দিলেন তাঁর সাহায্যের হাত। সাধক আরও এগিয়ে এলেন লাহিড়ী মহাশয়ের পাশে। একদম কাছটিতে, তারপর শ্যামাচরণের মেরুদণ্ডের বিশেষ একটি অংশে তাঁর আঙুল দিয়ে স্পর্শ করলেন। ঘটে গেল এক অলৌকিক ঘটনা। বিদুস্পৃষ্ট মানুষের মতো শ্যামাচরণের সারা দেহ কাঁপতে শুরু করল। অভূতপূর্ব এক আনন্দের শিহরনে তাঁর দেহমন ভরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়ে গেল। তিনি চিনতে পারলেন তাঁর পূর্বজন্মে ব্যবহার করা পবিত্র ধুনি, দণ্ড, কমণ্ডলু ও বাঘছালকে। বুঝতে পারলেন তাঁর সামনে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেই মহাপুরুষ তাঁর পূর্বজন্মের গুরু। শ্যামাচরণ তাঁর গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। আর সেই মহাপুরুষ মৃদু হেসে তাঁর প্রিয় শিষ্যকে টেনে নিলেন নিজের বুকে। সেই দ্রোণগিরির পর্বতগুহায় সেই মুহূর্তে নতুন এক ইতিহাসের সূচনা হল। সেই ইতিহাসের নাম যোগীবর শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়।

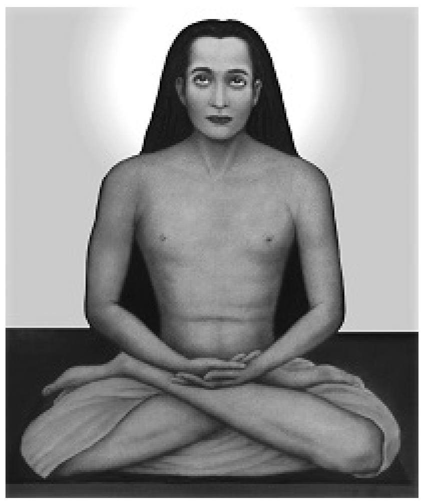
পরবর্তীকালে তাঁর তিন বিখ্যাত শিষ্য পৃথিবী কাঁপিয়ে দেবেন। তাঁরা হলেন স্বামী বালানন্দ ব্রহ্মচারী, ভাস্করানন্দ স্বামী ও যুক্তেশ্বর গিরি মহারাজ। গিরি মহারাজের অন্যতম শিষ্য তো আজ আমাদের চির প্রণম্য। তিনি হলেন পরমহংস যোগানন্দজি মহারাজ।

যথাসময়ে শ্যামাচরণের দীক্ষা পর্ব অনুষ্ঠিত হল। শুরু হল সাধনা। ক্ষেত্র তো আগেই প্রস্তুত ছিল। ফলে খুব দ্রুত তিনি সবকিছু আয়ত্ত করে নিলেন। গুরুদেবও খুব খুশি। রোজের সাধনা ও যোগের শিক্ষা শেষ

হওয়ার পরও মহাপুরুষ বাবাজি মহারাজ তাঁর শিষ্যকে ছেড়ে ফিরে যাননি তাঁর নিজের লোকে। শ্যামাচরণ নিজের কাজকর্ম সেরে প্রতিদিনই গুরুর কাছে আসতেন। বাবাজি মহারাজ তাঁকে নানা কথা বলতেন, শোনাতেন এই হিমালয়ের কোলে ঘটে যাওয়া অসংখ্য অলৌকিক কাহিনি।

গুরুই তাঁকে শুনিয়েছিলেন দ্রোণগিরির সেই সিদ্ধ মহাযোগীর কথা। বলেছিলেন, শোন শ্যামাচরণ, আমাদের এই গুহা থেকে মাইল পাঁচেক দূরে যে জীর্ণ মন্দিরটি রয়েছে, সেখানে আজও প্রতি রাতে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ আসেন। সেই মহাযোগীর বয়েসের কোনও হিসাব নেই। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন তিনি দ্রোণগিরির অভিভাবক, মহাভারতের যুগের দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামা। খড়ম পায়ে তিনি যখন ওই দেবালয়ে প্রবেশ করেন তখন চতুর্দিক আলোকিত হয়ে ওঠে।

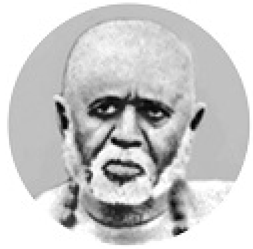
যোগ পথের নতুন পথিক শ্যামাচরণের মন সেই মহাত্মাকে দশর্নের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন। শিষ্যের কাতর মিনতি অগ্রাহ্য করতে পারলেন না সিদ্ধ বাবাজি মহারাজ। তিনি একদিন দূর থেকে ওই মহাত্মার দেহজ্যোতি দর্শন করিয়ে বলেছিলেন, এখানকার বহু মৃতপ্রায় মানুষকে তাঁর কৃপালাভের আশায় এখানে ফেলে রেখে যান স্থানীয় মানুষজন। মহাত্মার কৃপাদৃষ্টিতে তাঁরা বেঁচে ওঠেন।



পরবর্তীকালে লাহিড়ীমহাশয়ও তার কিছু প্রমাণ পান। একদিন তিন-চারজন সাধুর সঙ্গে তিনিও ভ্রমণে বেরিয়েছেন। বেশ অনেকক্ষণ হাঁটার পর এক সহযাত্রী সাধু ভুল করে জঙ্গলের বিষাক্ত একটি ফল খেয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, শুরু হয় ভেদবমি। এদিকে অনেকটা রাত হয়ে গেছে। সবাই খুব চিন্তিত। নীচে নামিয়ে আনাও অসম্ভব। তাঁরা তখন দ্রোণগিরির জীর্ণ দেবালয়ের কাছেই ছিলেন। সবাই মিলে পরামর্শ করে সেই সাধুকে মন্দিরের পাশে শুইয়ে রেখে তাঁরা নেমে আসেন।

সেই সাধু পরদিন একটু বেলার দিকে সুস্থ হয়ে আশ্রমে ফিরে বলেছিলেন, আমি তখন জীবনের সমস্ত আশা ছেড়ে দিয়ে ঈশ্বরের নাম করছি। এমন সময় সেই মহাত্মা সেখানে এসে আমাকে দেখতে পেয়ে গর্জন করে উঠে জানতে চাইলেন, এখানে কে রে তুই? তবে তিনি আমার কোনও উত্তরের প্রত্যাশা না করেই আমাকে এক বিশাল পদাঘাত করলেন। আমি গড়াতে গড়াতে অনেকটা নীচে নিম্নভূমিতে এসে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কিছুক্ষণের মধ্যে আমার নিজেকে বেশ সুস্থ মনে হল, শরীরের বলও ফিরে পেলাম। তারপর শুরু করলাম হাঁটা।

একবার চমকপ্রদ যোগবিভূতি দেখিয়ে লাহিড়ি মহাশয়কে দারুণ অভিভূত করেছিলেন তাঁর এক গুরুভ্রাতা। তিনি ছিলেন অষ্টসিদ্ধিপ্রাপ্ত যোগী। একদিন তাঁরা সবাই মিলে খরস্রোতা পার্বত্য নদী গগাস-এর ওপারে শৌচাদির জন্য গিয়েছেন। ইতিমধ্যে এসে গেল হড়পা বান। দুই পারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল চলে গেল জলের তলায়। কীভাবে নদী পার হওয়া যাবে এই চিন্তায় যখন সবাই ব্যস্ত তখন সেই গুরুভ্রাতা তাঁর মাথার পাগড়িটা খুলে বলেছিলেন, আমি এই বস্ত্রখণ্ডটি জলে ফেলছি, তোমরা এটা ধরে যত তাড়াতাড়ি পার ওপারে চলে যাও। সেদিন তাঁরা খরস্রোতা গগাস পার হয়েছিলেন ওইভাবে। পরবর্তীকালে যোগীবর লাহিড়ী মহাশয়ের মুখ থেকে এই ঘটনাটি তাঁর ভক্তরা বহুবার শুনেছেন।



ত্রৈলঙ্গ স্বামীজি ও তাঁর শেষ গৃহস্থ শিষ্য উমাচরণ মুখোপাধ্যায়

ধর্মসংক্রান্ত বক্তৃতা ও নানাজনের সঙ্গে ধর্মালোচনা করে উমাচরণ মুখোপাধ্যায়ের মনে পূনর্জন্ম সম্পর্কে কিছু প্রশ্ন জেগেছিল। সেইসময় তিনি মুঙ্গেরের এক বিখ্যাত চিকিৎসকের অধীনে কাজ করতেন। একসময় পূণর্জন্ম প্রায় তাঁর রাতের ঘুম কেড়ে নিল।

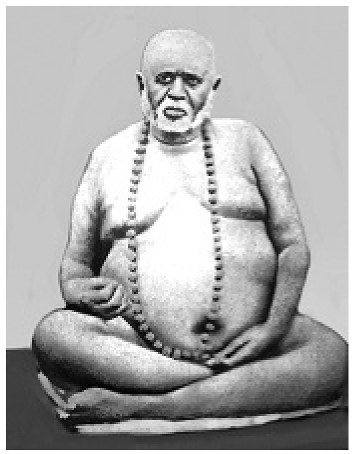
উমাচরণ মুখোপাধ্যায় কি কোনও বিখ্যাত মানুষ বা সিদ্ধ মনীষী ছিলেন? কাশীর অভিভাবক, সেখানকার সচল বিশ্বনাথ মহাপুরুষ ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির শেষ গৃহস্থ শিষ্য হলেন উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। পূণর্জন্ম তাঁকে কতটা উতলা করেছিল তা তাঁর এই লেখাটি পড়লেই বোঝা যায়। তিনি লিখছেন, 'জন্মান্তরবাদে আমার বিশ্বাস আছে। মানুষকে কর্মফল ভোগ করতেই হয়। শাস্ত্রে যেমন বলেছে সুকৃতীর ফল একরকম, দুষ্কৃতীর ফল আর একরকম। স্বর্গ কোথায়? নরক কোথায়? তা আমি জানি না। তবে কর্মফল অনুসারে উচ্চযোনি অথবা নিম্নযোনিতে জন্ম হবেই। বারে বারে আসা যাওয়া একথা আমি মনে প্রাণে বিশ্বাস করি। কিন্তু সমর্থন চাই। পণ্ডিতরা কী বলবেন? সমস্ত সংশয় দূর করতে পারেন তাঁরাই যাঁরা প্রকৃত মহাপুরুষ। তখনই ঠিক করলাম মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীর কাছে যাব এবং এ ব্যাপারে তাঁর কী অভিমত তা জানব। কারণ এই বিষয়ে জানার জন্য আমার মন বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল। সমস্ত সংশয় দূর করার জন্য তীর্থে বেরোব বলে মনস্থ করলাম। ভেবেছিলাম হরিদ্বার পর্যন্ত যাব, এবং প্রথমেই কাশীধাম। সেখানে ত্রৈলঙ্গ স্বামী আমার মনের সমস্ত সংশয় দূর করে দেবেন।'

একেবারে তিনমাসের ছুটি নিয়ে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় ১২৮৭ সালের ২ অগ্রহায়ণ তীর্থ ভ্রমণে বেরলেন। এবং প্রথমেই কাশীধাম। তবে কাশীতে পৌঁছে স্বামীজির করুণা পেতে তাঁকে যথেষ্টই ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছিল। প্রতিদিনই স্বামীজি ইঙ্গিত করা মাত্রই তাঁর শিষ্যরা উমাচরণবাবুকে প্রায় গলাধাক্কা দিয়ে মঙ্গল ভট্টজির বাড়ি থেকে বের করে দিতেন। তবু আশা ছাড়েননি তিনি। রোজই দু-বেলা স্বামীজির কাছে যেতেন। অবশেষে দয়া হল কাশীর ভৈরব সিদ্ধ যোগী ত্রৈলঙ্গ স্বামীজির। তিনি কাছে ডেকে নিলেন উমাচরণ মুখোপাধ্যায়কে। শুরু হল পরীক্ষা। সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি রাজি হলেন উমাচরণকে দীক্ষা দিতে।

প্রতিদিনের মতো সেদিনও তিনি দেখা করতে এসেছেন স্বামীজির সঙ্গে। কাশীর সচল বিশ্বনাথ তখন তাঁর অন্যতম শিষ্য মঙ্গল ভট্টজিকে কৃপা করে তাঁর বাড়িতেই অবস্থান করছেন। তিনি সারাদিনই থাকতেন খোলা আকাশের নীচে একটি বেদির ওপর। সেদিন সন্ধেবেলায় সেখানে উমাচরণ মুখোপাধ্যায় আসার পর স্বামীজি তাঁকে নিয়ে প্রবেশ করলেন বেদির নীচে অবস্থিত ছোট্ট একটি ঘরে। সেই ঘরটি আজও বিদ্যমান। ওই ঘরে বসেই একদিন কঠোর তপস্যা করেছিলেন স্বামীজির অপর এক শিষ্যা শঙ্করী মাতাজি।

স্বামীজি তখন মৌনী। তিনি ব্রত ভঙ্গ করে উমাচরণের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, 'তুমি যে বিষয়ে জানবার জন্য আমার কাছে এসেছ তা নিয়ে তোমার এত সংশয় কেন? দেখ, ত্রিকালদর্শী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ, মহর্ষি, দেবর্ষি, সিদ্ধ মহাত্মাগণ তপোবল, জ্ঞানবল ও যোগবলে যে সকল বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করে গেছেন তা নিয়ে কোনও সংশয় করা উচিত নয়।' এইরকম নানা কথা বলতে বলতে একসময় তিনি বললেন, শোন উমাচরণ তোমার পিতার নাম অমুক, তোমার নিবাস অমুক গ্রামে, তোমার বাড়িতে এতগুলি ঘর আছে, তোমার পরিবারে এতজন লোক বাস করেন,বাড়ির অমুক দিকে একটি পুকুর ও সেই পুকুরের ধারে এইসব গাছ আছে।

বিস্মিত উমাচরণ মুখোপাধ্যায়। কারণ তখনও তিনি স্বামীজির কাছে কী জানতে এসেছেন তা বলে উঠতে পারেন নি। সর্বজ্ঞ স্বামীজি মানুষের মনের কথা যে সহজেই পড়ে ফেলতে পারেন। তাই তো তিনি এতদিন নানা পরীক্ষা নিয়েই তবে কাছে আসার সুযোগ দিয়েছেন উমাচরণ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে মানুষটি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি সত্যিই আনকাট ডায়মন্ড নাকি একখণ্ড নিছক কয়লা!



সেদিন স্বামীজি এরপর জলদগম্ভীর কণ্ঠে বলেছিলেন, তুমি পূর্বজন্মেও ব্রাহ্মণ ছিলে এবং শিষ্টাচারী হিসেবে তোমার সুনাম ছিল। তুমি তখন প্রজাবৎসল জমিদার ছিলে। তুমি তোমাদের বাড়ির দোতলার দক্ষিণ দিকের একটি ঘরে বসবাস করতে। ওই ঘরের ভিতর দরজার ওপরে তিনটে সংস্কৃত শ্লোক নিজের হাতে লিখেছিলে —১) বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোহপরানি।/ তথা শরীরণি বিহায় জীর্ণন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।। ২) রুচীনাং বৈচিত্র্যাদৃজু কুটিলনানাপথজুষাং।/ নৃণামেশ গম্যস্ত্বমসি পয়সামর্নব ইব।। ৩) নির্মস্যাপ্রমেস্য নিষ্কলস্যাশরীরিণঃ।/ সাধকামাংহিতার্থায় ব্রহ্মেণ্যে রূপকল্পনা।। এখনও তোমার লেখা শ্লোক তিনটে ওখানে আছে। সুবিধামতো গিয়ে দেখে এসো।

একসময় গুরুর নির্দেশে শিষ্য উমাচরণ বাধ্য হলেন মুঙ্গের ছেড়ে শিবসাগরে যেতে। নতুন জায়গা, নতুন চাকরি। একবছর সেখানে কাজ করার পর তাঁকে বদলি করা হল গোলঘাটে। এইপ্রসঙ্গে উমাচরণবাবু লিখছেন, সেখানে যাওয়ার তিন-চার মাস বাদে রুরকি কলেজ থেকে এক যুবক ওভারসিয়ার হয়ে গোলঘাটে এলেন। আমি যে বাড়িতে থাকতাম সেই বাড়িতেই তিনি উঠলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেল।

একদিন কথায় কথায় জানতে পারলাম আমার পূর্বজন্মের বাড়ির কোনও মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের ঠিক হয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে তাঁর বিয়েও হয়ে গেল। সব কাজ মিটিয়ে তিনি আবার চাকরিতে যোগ দিলেন। একদিন গল্প করতে করতে হঠাৎই আমার সেই বন্ধুর কাছে তাঁর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করামাত্র তিনি এককথায় রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু আমার মন্দ কপাল। সেই যুবক দুশো টাকার মাইনের এক চাকরি

পেয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। দুঃখ পেলেও আমার কিছু করার ছিল না। তবু আশা ছাড়িনি, সেই যুবককে উপলক্ষ করে তাঁর শ্বশুরমশাইকে মাঝে মাঝেই চিঠি লিখতে শুরু করলাম। তিনিও উত্তর দিতেন।

একবার একটি চিঠিতে লিখলাম, আপনাদের দক্ষিণ দিকের ঘরের ভিতরে দরজার ওপর তিনটে শ্লোক লেখা আছে বলে শুনেছি। যদি আপনি সেগুলো আমাকে লিখে পাঠান তাহলে অত্যন্ত খুশি হব। তিনি লিখে পাঠিয়েছিলেন। সেগুলো পড়ে আমি অবাক হয়েছিলাম। বাবা আমার পূর্বজন্ম নিয়ে সমস্ত সংশয় এভাবে ভেঙে দিয়েছিলেন। সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম বাবার ইচ্ছাতেই ওই যুবক বাধ্য হয়েছিলেন গোলঘাটে আসতে।



বামদেব ও কালপুরুষ

১৩১৮ সালের শ্রাবণ মাস। সেইসময় এখনকার মতো নিম্নচাপের দয়াতেই শুধুমাত্র বৃষ্টি হত না। প্রকৃতির নিয়ম মেনেই তিনি তাঁর কাজকর্ম সারতেন। সেই শ্রাবণেও একদিন মাঝরাত থেকে শুরু হল অঝোর ধারায় বৃষ্টি। ছোট্ট তারাপুর গ্রামের দৈনন্দিন কাজকর্ম হঠাৎই কেমন যেন থমকে গেল। উপচে পড়া দ্বারকার জলে অর্ধেক গ্রাম প্রায় ডুবুডুবু। শ্মশানের অবস্থাও তথৈবচ। ঝুপঝুপ করে একের পর এক মাটির বাড়ি ভেঙে পড়ছে। কিন্তু ওই পীঠের ভৈরব নিষ্কাম বাল ব্রহ্মচারী বামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ওরফে শ্রীশ্রীবামাক্ষেপাবাবার সেদিকে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। দিনকয়েক ধরেই তাঁকে দেখে মনে হচ্ছে তিনি যেন কোনও বিষম ব্যাপার নিয়ে খুবই চিন্তিত। সেদিন ওই ভয়ঙ্কর আবহাওয়াকে উপেক্ষা করেই তিনি তাঁর কুটিরের সামনে বসে আপন মনে গান গাইছিলেন—

'মরিব আর অমনি যাইব
ব্রহ্মে মিশায়ে।
তারার চরণে লুটায়ে
শিমূল তলায় লুটায়ে।
ক্ষেপা মরিবে, অমনি যাইবে
ব্রহ্মে মিশায়ে।
কাজ কিরে মন ভোগাশ্রয়ে
এ দেহ ধরিয়ে।'

গান শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হল আর এক সমস্যা। বাবা ঘন ঘন সমাধিস্থ হতে থাকলেন। যেসব ভক্ত বা শিষ্য এতক্ষণ তন্ময় হয়ে গান শুনছিলেন তাঁরাও বাবাকে ওইরকম অবস্থায় দেখে খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তাঁরা বাবার গাওয়া গানের মানেও ততক্ষণে বুঝতে পেরে গেছেন। তাঁদের মনেও আসন্ন অমঙ্গলের চিন্তা জেগে উঠল।

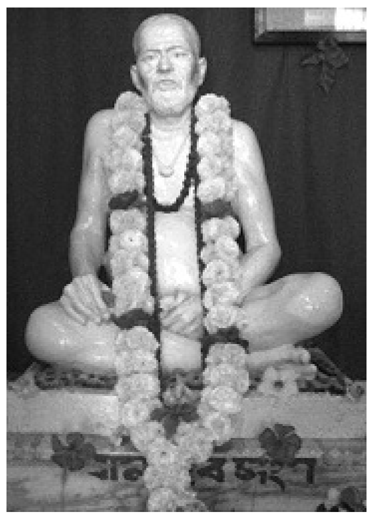
আর ওইদিন সন্ধ্যাবেলায় তারাপীঠ মহাশ্মশানে পদধূলি পড়ল কদাকার, কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘকায় শীর্ণাকৃতি এক কালপুরুষের। তাঁকে অনায়াসেই জীবন্ত এক উৎপাতের সঙ্গে তুলনা করা যেতেই পারে।

'তারাপীঠ ভৈরব' গ্রন্থে মহাত্মা সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, 'তাঁর কটীতে কৃষ্ণবর্ণ জীর্ণাবাস, মস্তকে অপরিপাটি কর্কশ কেশগুচ্ছ, মুখমণ্ডল অর্দ্ধ-গোলাকার এবং চক্ষুদ্বয় বর্ত্তুলাকার, রক্তবর্ণ ও তীকষ্ন। প্রশস্ত নাসারন্ধ্র ও বিস্তীর্ণ মুখগহ্বরে দানব-দৈত্যের মত বৃহৎ দন্তপংক্তি তাকে আরও কদর্য ও বীভৎস করে তুলেছিল।'

উন্মাদপ্রায় সেই আগন্তুককে অনেকেই সেই সময় যমদূতের সঙ্গে তুলনা করতেন এবং কেউই তাঁর ছায়া পর্যন্ত মাড়াতে চাইতেন না। গলিত শবমাংসই ছিল তাঁর প্রিয় খাদ্য এবং তিনি মহাশ্মশানের বাইরে খুব একটা বেরোতেন না। তাঁর আচার-আচরণ, কথাবার্তা প্রভৃতির মধ্যে একটা অমঙ্গলের চিহ্নই ফুটে উঠত। আসন্ন অমঙ্গলের আশঙ্কায় এলাকার বাসিন্দারা সবসময়ই খুব মনমরা হয়ে থাকতেন।

তারামায়ের ক্ষেপা ছেলে বামদেবের সঙ্গে সেই কালপুরুষের দেখা হল পরদিন সকালে। বাবা তখন শিমূল তলায় বসে আছেন। হঠাৎ সেই মানুষটি এক টুকরো শবমাংস চিবোতে চিবোতে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখে ভীষণই রেগে গেলেন বামা ক্ষেপা। তিনি গালিগালাজ করতে শুরু করলেন। কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীও নেহাত কম যান না। তিনি পালটা গালি দিতে লাগলেন।

কালপুরুষের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে বাবা ঘন ঘন সমাধিস্থ হতে লাগলেন। ভক্তদের সঙ্গে কথা বলা ও উপদেশ দেওয়া একদম ছেড়ে দিয়ে বাকসংযম করলেন। সারাদিনই তাঁর দু-চোখ বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল অবিরাম জলের ধারা, প্রেমাংশু। এদিকে সেই কালপুরুষ সারাদিনে নিয়ম করে তিনবার সকাল, দুপুর ও রাতে বাবার অবস্থা দেখে যেতেন। এবং সমাধিস্থ বাবাকে দেখে তিনি মহাশ্মশান কাঁপিয়ে অট্টহাস্য করে চলে যেতেন।



দিনটা ছিল পয়লা শ্রাবণ। মহাশ্মশানের অর্ধেক দ্বারকার জলে প্লাবিত। বামদেব সেইসময় তাঁর কুটিরেই বসে ছিলেন। সঙ্গে ছিলেন অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতীশ্বর ভট্টাচার্য, অমূল্যধন ভট্টাচার্য, নগেন্দ্রনাথ বাগচি, সুশীলকুমার রায় ও আরও দুএকজন। বাবার অন্যতম প্রিয় সারমেয় কালু বাবার ঠিক পায়ের কাছেই চুপটি করে বসেছিল। ওই দুর্যোগকে উপেক্ষা করেই বাবার সামনে মৃত্যুদূতের মতো উপস্থিত হলেন সেই কালপুরুষ। বামদেব তাঁর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখ তুলে গুমরে উঠল কালু। কিন্তু কোনও দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সেই মৃত্যুদূত বিকট হেসে বামদেবকে বললেন, 'আর কেন?'

বামদেব গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, 'হু।'

আর সহ্য করতে পারলেন না নগেন্দ্রনাথ বাগচি মহাশয়। তিনি প্রায় ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সেখান থেকে তাড়ালেন সেই বিকটদর্শন মানুষটিকে। বামদেব তখনও সমাধিস্থ। তারপর দিন সকালে তাঁর সেই সমাধি ভঙ্গ হল। তিনি বাগচি মহাশয়কে কাছে ডেকে বললেন, 'নগেনবাবা, ওই নিমতলায় বেদজ্ঞ মোক্ষদানন্দ বাবার সমাজের কাছে আমায় উত্তর মুখ করে বসিয়ে সমাজ দেবেন বাবা।' এই কথা কটি বলে তিনি আবার সমাধিস্থ হলেন।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ঘটতে চলেছে তা সেইমুহূর্তে সবাই বেশ ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। একটা ঝড় আসছে আর সেই প্রবল তাণ্ডবে লন্ডভন্ড হবে তাঁদের শান্ত, সুখের জীবন এই ধারণাটা তাঁদের মনে আরও দৃঢ় করে তুলল বাবার এই কটি কথা। বামদেবের প্রিয় সারমেয়কুল কালু, ভুলু ও শ্বেতফুলও এক মুহূর্তের জন্য তাঁর কাছছাড়া হচ্ছিল না। বামাক্ষেপা তখনও যোগনিদ্রায় সমাহিত। ইতিমধ্যে মন্দিরে সন্ধ্যা আরতি শুরু হয়েছে। মাতৃনাম ও ঢাক-ঢোল, মৃদঙ্গ ও শঙ্খ ধ্বনিতে তারাপুর তখন আচ্ছন্ন। বামদেবের সুদীর্ঘ সমাধি ভঙ্গ হল। ভক্ত ও শিষ্যরা তাঁকে স্বাভাবিক অবস্থায় দেখে বেশ আনন্দ পেলেন। কিন্ত স্বয়ং বামদেব! দুবার তারামায়ের নাম উচ্চারণ করে পুনরায় সমাধিস্থ হলেন। ক্রমশ তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাস মৃদু হতে লাগল।



বামদেবকে প্রণাম করলেন কালপুরুষ

আর হাতে সময় নেই। এবার যাওয়ার পালা। বড় মায়ের ইচ্ছানুযায়ী সমস্ত কাজই তো সম্পন্ন হয়েছে। আর কী দরকার এই ধরাধামে থাকার! বন্দরের কাজ হল যে সাঙ্গ এবার ভাসার পালা। তারা মায়ের নির্দেশেই বোধহয় তারাপীঠের শ্মশানে উপস্থিত হয়েছেন মূর্তিমান উপদ্রব, এই কালপুরুষ।

পয়লা শ্রাবণের রাত। রাতের সঙ্গে পাল্লা দিয়েই বেড়ে চলেছে দুর্যোগ। এদিকে বৃষ্টির তেজ যতই বাড়ছে, বাবা বামদেবের শ্বাসপ্রশ্বাস ততই মৃদু হতে শুরু করল। এইসব লক্ষণ দেখে ভক্তরাও খুব ভয় পেয়ে গেলেন। সেইসময় কলকাতার খ্যাতনামা কবিরাজ গণনাথ সেন মহাশয়ের কৃতী ছাত্র কবিরাজ বৈদ্যনাথ সেন রামপুরহাটে থাকতেন। তাঁকে নিয়ে আসার জন্য বাবার এক ভক্ত তাঁর বাড়ির দিকে রওনা হলেন। কিন্তু বামদেবের অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হতে লাগল। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাসের গতি আরও কমে গেল। আর এইরকম সময়ে মন্দিরে শুরু হল মায়ের মহানিশার পুজো। ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ ও জয় জয় তারা ধ্বনিতে ক্ষুদ্র তারাপুর তখন মুখরিত। শেষ বারের মতো চোখদুটো উন্মিলীত করে বামদেব তাকালেন মন্দিরের দিকে। তারপর মৃদু স্বরে 'তারা', 'তারা' বলে দুবার মাকে ডেকে নিশ্বাস গ্রহণ করে আবার সমাধিস্থ হলেন। এরপর ধীরে ধীরে তাঁর শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল।

তারপর কেটে গেছে আরও অনেকক্ষণ। তখনও কবিরাজমশাই এসে পৌঁছননি। সবাই ব্যাকুল হয়ে বসে আছেন বাবাকে ঘিরে। বাবা চলে গেছেন এই সত্যটা কেউই বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। এমন সময় মৃত্যুরূপী সেই কালপুরুষ কুটির দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। তারপর বামদেবকে ওই অবস্থায় দেখে বিকট অট্টহাস্য করে বললেন, 'তোরা কাকে আর কবিরাজ দেখাবি, ওতো অনেকক্ষণ আগে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করে নিরাকারে লীন হয়েছে। আর দেরি করছিস কেন? এইবার সমাজ দিয়ে দে।' তারপর সেই মানুষটি আবার অট্টহাস্য করতে করতে মিলিয়ে গেলেন অন্ধকারের মধ্যে।

এই ঘটনাটি ঘটার কিছুক্ষণ বাদে কবিরাজ মশাইকে নিয়ে সেই ভক্ত ফিরে এলেন। কবিরাজ বৈদ্যনাথ সেনও বাবার বিশেষ ভক্ত ছিলেন। তিনি বাবার নাড়ি বিশেষ ভাবে পরীক্ষা করে কেঁদে ফেললেন। বাবার নাক দিয়ে রক্ত গড়াতে দেখে সবাই বুঝতে পেরেছিলেন, বাবার পবিত্র প্রাণবায়ু ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করেই ব্রহ্মে বিলীন হয়েছেন। দিনটা ছিল ২ শ্রাবণ।

পরদিন সকালে বাবার পবিত্র দেহকে সমাজ দেওয়া নিয়ে শুরু হল তীব্র মতবিরোধ। বেশিরভাগ ভক্তের মত বাবাকে সমাজ দেওয়া হোক বাবার জন্মভূমিতেই। কিন্তু তাঁদের বিরোধিতা করলেন নগেন্দ্রনাথ বাগচি সহ গুটিকয়েক ভক্ত। কারণ বাবা নগেন্দ্রনাথকে শেষ বেলায় ডেকে বলেছিলেন, নগেনবাবা, আমাকে শ্মশানের নিমতলায় উত্তর মুখ করে সমাজ দিও।

ব্যাপারটার মীমাংসা অবশ্য খুব সহজে হয়নি। বিস্তর জলঘোলা হয়েছিল। অশান্তি এত প্রবল আকার ধারণ করেছিল যে রাজ কর্মচারী স্বয়ং এসেও সমস্যার সমাধান করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন তারাপীঠের আতঙ্ক সেই কালপুরুষ। তাঁর উগ্র মূর্তি দেখে সবাই খুব ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি চিৎকার করে বললেন, তোরা এত কি গোলমাল করছিস? আমার সঙ্গে আয় আমি জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছি তোদের।

সেই আগন্তুকের আদেশ সবাই মাথা নীচু করে সেদিন মেনে নিয়েছিলেন। বাবা বামদেব যে নিম গাছতলার কথা বলেছিলেন সেই গাছের কাছে এসে তিনি বলেছিলেন, এখানেই ওঁকে সমাজ দে। কালপুরুষের আদেশ মতো ভক্ত ও শিষ্যরা খোঁড়ার কাজ শুরু করলেন। কিন্তু কিছুটা খোঁড়ার পরই বহুযুগের 'তারামা'-র মন্দিরের ভিত্তি প্রকাশ পেল।

সম্ভবত ভক্ত গন্ধবণিক জয়দত্ত এই স্থানে তারা মায়ের মন্দির স্থাপন করেছিলেন। সেই স্থান অর্থাৎ মায়ের কোলেই আশ্রয় নিলেন চির ব্রহ্মচারী বাবা বামদেব। সমাধির কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেই কালপুরুষ সেইখানে বসে বামদেবের পবিত্র শরীরে পুষ্পবর্ষণ করতে লাগলেন। তারপর সব কাজ মিটে যাওয়ার পর তিনি বামদেবকে ভক্তি সহকারে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালেন এবং প্রবল অট্টহাস্যে শ্মশানকে কম্পিত করে তীব্র বেগে ওই স্থান ছেড়ে গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন।

কে ছিলেন এই কালপুরুষ? তিনি কি তারা মায়ের নির্দেশেই বাবাকে শেষসময়ে সঙ্গ দিতে এসেছিলেন। যদি সঙ্গই দিতে আসেন তাহলে তিনি বাবার সঙ্গে এত খারাপ ব্যবহারই বা করতেন কেন! তাঁদের দুজনের এইরকম অদ্ভুত লীলা খেলা সত্যিই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা অসম্ভব। তবে ওই সময়কার বহু মানুষই ওই কালপুরুষকে এই পৃথিবীর বাসিন্দা বলে মনে করতেন না। এবং বামদেবের তিরোধানের পর তাঁকে আর কেউ কোনওদিন সেখানে দেখতে পাননি।



তারাপীঠের সচল ভৈরব ও তারাখ্যাপা

ভগবান অমরনাথ, শৈব ভক্তদের কাছে এক পরম তীর্থস্থান। সেই দেবাদিদেবের তপস্যায় বসেছেন আর এক তাপস, তরুণ তারানাথ। তপস্যা বেশ জমে উঠেছে। নির্জন গুহায় ঈশ্বর চিন্তায় মগ্ন তিনি। তাঁকে বিরক্ত করার মতো আশেপাশে কেউ নেই। এই সাধনায় বসার আগে অবশ্য তিনি বেশ কিছুদিন সাধক ব্রহ্মানন্দ ভারতীর কাছে হঠযোগ ও আসন শিক্ষা করেছেন। সেই বিদ্যায় সিদ্ধি লাভ করেই আজ তিনি পৌঁচেছেন এই জায়গায়।

একদিন, রাত তখন বেশ গভীর। আসন ছেড়ে হঠাৎ গুহার বাইরে এসে দাঁড়ালেন অকুতোভয় সাধক তারানাথ। বলা যেতে পারে, তাঁকে কে যেন প্রায় টেনে বের করে আনল গুহার বাইরে। পূর্ণিমার রাত। ফুটফুটে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে চরাচর। আকাশের দিকে তাকিয়ে ভীষনই চমকে উঠলেন তরুণ তপস্বী তারানাথ। তিনি দেখতে পেলেন, আকাশমার্গে ভেসে বেড়াচ্ছেন এক দিব্যকান্তি মূর্তি। ব্যস, এরপরই চোখের নিমেষে শূন্যে মিলিয়ে গেল সেই মহামানবের ছায়া মূর্তি। অবিশ্বাস্য দৃশ্য। প্রথমে চোখের ভুল ভেবে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দিতেও চেয়েছিলেন তারানাথ। ঠিক সেইসময়, তিনি শুনতে পেলেন অলৌকিক এক দৈববাণী 'বামা বীরভূম'।

কে এই তরুণ তাপস তারানাথ! তাঁর আসল নাম প্রমথেশ। জন্ম প্রাচীন ব্রহ্মপুরায়। আদি নিবাস ছিল অধুনা বাংলাদেশের রংপুরে। তাঁর বাবা গাড়োয়ালের রাজার দপ্তরের প্রধান কর্মচারী ছিলেন। পিতার অধিক বয়েসের সন্তান প্রমথেশ। অমরনাথ ও বটুক ভৈরবের পুজো করেই প্রমথেশকে পুত্র রূপে পেয়েছিলেন তাঁর পিতা ও মাতা। এবং পুজোয় সন্তুষ্ট হয়ে দেবাদিদেব অমরনাথ স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেছিলেন, খুব শিগগিরই তোমাদের এক পুত্র সন্তান হবে। তবে সে বেশিদিন সংসারে বদ্ধ হয়ে থাকবে না। অল্প বয়েসেই গৃহত্যাগ করবে।



স্বপ্নে 'দেব' অমরনাথকে দর্শনের কিছুদিন বাদেই পৃথিবীর আলো দেখলেন প্রমথেশ। কিন্তু মায়ের স্নেহ লাভের সৌভাগ্য তাঁর কপালে বোধহয় লেখা ছিল না। বাল্যকালেই তিনি মাতৃহারা হন। এবং স্বপ্নাদেশ মতো উপনয়নের পরেই তিনি সংসার ত্যাগ করেন।

শুরু হল প্রমথেশের বৈরাগ্য জীবন। ঈশ্বর লাভের প্রবল পিপাসা নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে শুরু করলেন হিমালয়ের নানা তীর্থে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি এসে পৌঁছলেন হরিদ্বারে। এখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল সাধক ব্রহ্মানন্দ ভারতীর সঙ্গে। তাঁর কাছেই শুরু হল প্রমথেশের হঠযোগ শিক্ষা। কিন্তু সবকিছু আয়ত্ব করেও তাঁর মনে কোনও শান্তি নেই। না পাওয়ার বেদনায় সর্বদাই তিনি জর্জরিত। শান্তির সন্ধানে তিনি আবার বেরোলেন পরিক্রমায়। পৌঁছলেন অমরনাথ। তারপর সবটাই ইতিহাস!

আর দৈববানী 'বামা বীরভূম' শোনার পর থেকে সাধকের মন আর নিজের আয়ত্বে রইল না। তারানাথ সমতলে নেমে আসবেন বলে ঠিক করলেন। শুরু হল পথ চলা। এইসময় আবার এক অলৌকিক ঘটনা ঘটল। তারানাথকে দর্শন দিলেন তাঁর মাতামহী। সেই দিব্যমূর্তি দর্শন করে মোহিত হলেন তরুণ সাধক তারানাথ।

একসময় পথ চলা শেষ হল। সাধক নেমে এলেন সমতল ভূমিতে। এইসময় আবার তিনি শুনতে পেলেন এক দৈববানী 'বামা বীরভূম'। এই ক্ষণের খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে মহাত্মা সুশীল কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারাপীঠ ভৈরব' গ্রন্থে। সেখানে তিনি লিখছেন, 'এই বানী শ্রবণ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল যেন সমস্ত পর্বত কম্পমান। শুন্যে তিনি এক বিরাট পুরুষকে দেখতে পান। তিনি পদ্মাসনে উপবিষ্ট, তাঁর দীর্ঘ হস্তদ্বয় জানুর ওপর বিষয়ী মুদ্রায় স্থাপিত ছিল, বক্ষ স্ফীত ও রুদ্রাক্ষ মাল্যে ভূষিত। মুখমণ্ডল জ্ঞানদীপ্তে দীপ্তিমান, আয়ত ও অর্ধ নিমীলিত সুতীক্ষ্ন নেত্র হতে তেজ নির্গত হচ্ছে। দোদুল্যমান বিবর্ণ কেশজাল বিরাট মস্তকে শোভা পাচ্ছে। প্রশস্ত উন্নত কপাল, অলৌকিক মূর্তি ধীরতা ও স্থিরতার পরিচয় দিচ্ছে। অবয়বে কোমলতায় শিশুভাব পরিস্ফুট। একসময় অলৌকিক মূর্তি শূন্যে লীন হল।' দেবমূর্তি দর্শন করলেন তারানাথ। তাঁর সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হল। তিনি কেঁপে উঠলেন। আকুল হলেন সেই দেবতাকে দর্শনের জন্য।

ইতিমধ্যে তারানাথের সঙ্গে আলাপ হয়েছে কাশ্মীর সরকারের ঠিকাদার গগন বিশ্বাসের। তিনি আগে থেকেই চিনতেন মাতৃসাধক বামদেবকে। তারানাথের মুখে সব কথা শুনে বিশ্বাস মহাশয় বললেন, আপনি যাঁকে দর্শন করেছেন তিনি তারাপীঠের ভৈরব বামাখ্যাপা। তারা মায়ের প্রিয় সন্তান। অসীম শক্তিধর এক সাধক। আপনি সত্যিই ভাগ্যবান।

তারানাথের মনে আর কোনও দ্বন্দ্ব নেই। তিনি বেরিয়ে পড়লেন তাঁর ইষ্টদেবের সন্ধানে। কিন্তু বীরভূমে পৌঁছতে তাঁর প্রায় ছ'মাস সময় লেগে গেল।

তখন ১৮৮৭ সাল। মহারানি ভিক্টোরিয়ার জুবিলি উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত ইংরেজ কর্তারা। ডাঃ হেমচন্দ্র সেন তারানাথকে সেই উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালেন। সাধকও সেন মহাশয়ের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না। বীরভূম যাত্রা স্থগিত রেখে তিনি দিল্লি পৌঁছলেন। এরপরই ঘটল আর এক অলৌকিক ঘটনা। আবার দৈববানী 'তোমাকে বড় দরকারে প্রয়োজন, দেরি করো না, শীঘ্র চলে এসো।' তারানাথের আর উৎসব দেখা হল না। তিনি সেই মুহূর্তে দিল্লি পরিত্যাগ করে যাত্রা করলেন বীরভূমের উদ্দেশে।



জ্বলন্ত চিতায় তারামাকে দর্শন করলেন তারানাথ

মাসটা কার্তিক। বেশ ঠান্ডাও পড়েছে। প্রায় বাহাত্তর ঘণ্টা ট্রেন- সফর করে বীরভূমের মল্লারপুর স্টেশনে এসে নামলেন ব্রহ্মচারি প্রমথেশ। রামপুরহাটের আগের স্টেশনটিই মল্লারপুর। সেখান থেকে তারাপীঠ-চণ্ডীপুরের দূরত্ব প্রায় পাঁচ মাইল। প্রমথেশ সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ তায় হঠযোগী। তাই যত্রতত্র আহারে তাঁর বড়ই অনীহা। ফলে তিনদিন তিনি জল ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেননি। এখন বড় ক্লান্ত মনে হচ্ছে নিজেকে। তবু সময় নষ্ট করলেন না প্রমথেশ। স্টেশনে বসে না থেকে তিনি নেমে এলেন পথে। শুরু হল পথচলা। পায়ে হেঁটে তিনি এসে পৌঁছলেন ভাবী গুরু বামদেবের বড়মায়ের সাম্রাজ্যে।

এদিকে শিমূলতলায় বসে শিষ্যের আগমন বার্তা অনেক আগেই জানতে পেরেছিলেন তারাপীঠের সচল ভৈরব, স্বয়ং মহাদেব বামদেব। ভক্ত ও পাণ্ডাদের ডেকে তিনি হাসতে হাসতে বলেছিলেন, 'দাদা আজকেই আসছেন।

প্রমথেশ এলেন। প্রবেশ করলেন মন্দিরে। তারামাকে প্রাণভরে দর্শন করে প্রণাম করলেন। এইসময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল জনৈক কালীপাণ্ডার। তারপর কী ঘটল সেই প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে ব্রহ্মচারী প্রমথেশ সম্পর্কে দু-চার কথা বলা অবশ্যই প্রয়োজন। সদ্য তিনি হিমালয় থেকে নেমে এসেছেন সমতলে। দৈববাণী 'বামা বীরভূম' তাঁর মনকে বড়ই উতলা করে তুলেছে। তখনকার প্রমথেশকে নিয়ে ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সিদ্ধসাধক তারাখ্যাপা' গ্রন্থের একজায়গায় লিখছেন, 'তরুণ যোগী তারানাথের এখন পূর্ণযৌবন। দীর্ঘকাল হিমালয়ের জলবায়ুতে শরীর সুদৃঢ়, সবল ও পরিপুষ্ট। সুবিস্তারিত বক্ষস্থল, আজানুলম্বিত বাহু, চক্ষুতে অপূর্বজ্যোতি, হাতে পরশু (কুঠার) ও দীর্ঘ যষ্ঠি, পায়ে পার্বত্য পদত্রাণ, পরিধানে রেশমী বস্ত্র, গায়ে রেশমী পিরাণ, কাঁধে নিজের ব্যবহারের দ্রব্যসম্ভার।'



পরশু হস্তে পরশুরামরূপী প্রমথেশকে দেখে কালীপাণ্ডা প্রথমে বেশ ভয় পেয়েছিলেন। কিন্তু বামদেবের নাম শোনার পর তাঁর সেই ভয় কেটে গেল। তিনিই প্রমথেশকে পৌঁছে দিলেন তাঁদের বাবার কাছে। অবশেষে দেখা হল গুরু বামদেবের সঙ্গে সঙ্গে শিষ্য প্রমথেশ বা ভাবীকালের তারানাথ কিংবা তারা খ্যাপার।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় তাঁর বইতে এই ক্ষণটির সুন্দর এক চিত্র এঁকে রেখেছেন আমাদের জন্য। তারানাথ গুরুর পদপ্রান্তে উপনীত হওয়া মাত্র বামদেব বললেন, দাদা এসেছেন? আমি কতই ভাবছিলাম।

বীরাচারী সাধক তারানাথ এরপর গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন ডাকলেন আমায়?

তাঁর থেকে প্রায় ন'বছরের ছোট শিষ্যকে বামদেব উত্তরে বলেছিলেন আপনার জন্ম ভ্রাতৃদ্বিতীয়াতে। কাল কিংবা তার পরেরদিন নয়, আপনার সঙ্গে আমার বোঝাপড়া হবে তারও পরের দিন।

চমকে উঠলেন প্রমথেশ। সেই মুহূর্তে তাঁর গুরু যে সত্যিই অন্তর্যামী তা তিনি উপলব্ধি করতে পারলেন। তারানাথের জন্ম ১২৫৩ সালের (ইংরেজি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দ), ৮ কার্তিক, শুক্রবার শেষরাতে, শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে।

শিষ্যকে চিন্তান্বিত দেখে বামদেব এরপর স্নেহঝরা কণ্ঠে বলেছিলেন, আপনি ক'দিন কিছু খাননি, একটু ছোলা সিদ্ধ ও মুড়ি খান। গুরুর নির্দেশে ছোলা সিদ্ধ ও মুড়ি দিয়ে তাঁর উপবাস ভঙ্গ করলেন। বামদেব মৃদু হেসে শিষ্যকে বললেন, আজ রাতে অনেক কিছু হবে। তৈরি থাকবেন।

তারাপীঠে কয়েকজন ভৈরব ও ভৈরবী সেদিন এসেছিলেন। কৃষ্ণা চর্তুদশীর রাত। তাঁদের অনুরোধে বামদেব রাজি হলেন চক্রানুষ্ঠানে চক্রেশ্বরের পদ গ্রহণ করতে। শিমূলতলার সেই অনুষ্ঠানে গুরুর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তারানাথও। এই প্রথম তিনি তন্ত্রাচার দেখলেন। অনুষ্ঠান শেষে অন্য সাধক-সাধিকারা যখন বিশ্রাম নিতে গেলেন সেইসময় বামদেব তাঁর ভাবী শিষ্যকে নিয়ে প্রবেশ করলেন মহাশ্মশানের আরও গভীর প্রান্তে।

তাঁরা শবভূমিতে প্রবেশ করা মাত্র হঠাৎই একটা চিতা জ্বলে উঠল। আর সেই প্রজ্জ্বলিত চিতার মধ্যে তারানাথ দর্শন করলেন মা তারাকে। আর সেই সঙ্গে একযোগে শত শত হাতির বৃংহণধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠল শ্মশান। বিন্দুমাত্র ভয় পেলেন না তারানাথ। তিনি গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন, কর্তা, এসব কি আপনার খেলা, ঐশ্বর্য?

বামদেব উত্তরে বললেন, এ তো তারামায়ের রাজ্য, এসব মায়ের ঐশ্বর্য।

পরদিন সূর্যগ্রহণ এবং অমাবস্যা। হঠযোগী প্রমথেশ ঠিক করলেন, এইরকম দিনে কোনও রকম খাদ্য গ্রহণ করবেন না,সারাদিন জপতপ করেই কাটাবেন। কিন্তু তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হতে দিলেন না গুরু বামদেব। তিনি শিষ্যকে দিয়ে মাংস ও পরমান্ন রান্না করিয়ে নিজে গ্রহণ করলেন এবং তারানাথকে বাধ্য করলেন সেই প্রসাদ খেতে।

ভাবী গুরুর আদেশ অমান্য করতে পারেন নি প্রমথেশ। গুরুর প্রসাদ খেয়ে বলেছিলেন, কর্তা সবই আপনার বিপরীত!

উত্তরে বামদেব বলেছিলেন, এ যে শিমূলতলা, তারা মা যে বামা।

এই উত্তর শুনে তারানাথ বুঝতে পারলেন, তাঁর গুরু স্বয়ং মহেশ্বর, অবধূত।

সব কিছু বোঝার পরও তারানাথ বামদেবের কাছে জানতে চেয়েছিলেন, পিশাচে পেলে সত্যবর্জিত হয়?

গুরু মৃদু হেসে মায়ের হাতের খড়গটি দেখিয়ে বলেছিলেন, ইনিই গুরু, দেব-দানব-যক্ষ-গন্ধর্ব সকলেই এর উপাসক। এতেই রয়েছে ব্রহ্মদণ্ড, আবার এটা দিয়েই পিশাচমোচন হয়। এই খড়গ মহেশ্বরের প্রাণ, রোহিণী এর উৎপত্তি স্থান, রুদ্রদেব তাঁর গুরু।

মুগ্ধ তারানাথ গুরুর কথা শেষ হওয়া মাত্রই তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়লেন। এদিকে রাতের মেয়াদ প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। অন্ধকার ক্রমশ পাতলা হচ্ছে। আর একটু বাদেই সূচনা হবে নতুন এক সকালের। গুরু বামদেব শিষ্যের পিঠে হাত রেখে বললেন, শুরু হল আপনার পথ চলা। নির্ভীক তারানাথ আবার গুরুর চরণ স্পর্শ করে উঠে দাঁড়ালেন। আর ঠিক তখনিই নতুন দিনের নতুন সূর্য উঁকি দিলেন পূব আকাশে।

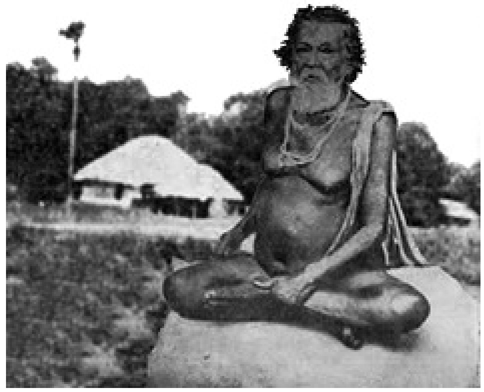


শবসাধনায় বসলেন তারানাথ

হাতে আর খুব বেশি সময় নেই। আর মাত্র কয়েক ঘন্টা। তারপরই শুরু হবে এক নতুন জীবন। তারাপীঠে আসার পর থেকে তারানাথও খুব প্রয়োজন ছাড়া গুরুর কাছ-ছাড়া হচ্ছেন না। এবং বামদেবও চাইছেন শিষ্য তাঁর আশেপাশেই থাকুন। দুজনের মধ্যে অনর্গল কথাবার্তাও হচ্ছে, কিন্তু আশপাশের কেউই তার কিছুই বুঝতে পারছেন না। কারণ দুজনেই সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছেন। ফলে অন্যদের পক্ষে তা মর্মোদ্ধার করা সত্যিই দুরূহ ব্যাপার।

দেখতে দেখতে দিন কেটে গেল। টুপ করে নেমে এল রাত। কার্তিক মাসের অমাবস্যার রাত। আর একটু বাদেই শুরু হবে মায়ের পুজো। চারিদিকে অসীম অন্ধকার। সেই গভীর মহানিশায় গুরু বামদেব শিষ্যকে সাধন মার্গের এক দুরূহ শিক্ষা দিলেন। শিষ্যকে নিয়ে তিনি প্রবেশ করলেন মহা শ্মশানের একদম গভীরে। সেই রাতের অপূর্ব বর্ণনা দিয়ে গেছেন ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়। তিনি লিখছেন, 'রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, শ্মশান জনমানবশূন্য। শেয়াল, কুকুর অস্থিচর্বনে ব্যস্ত। মাঝে মাঝে তাদের চিৎকারে শ্মশানের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হচ্ছে। কখনও বা শকুনি গাছের ওপর বসে হৃদয়বিদারক ট্যা-ট্যা শব্দে আর্তনাদ করছে। তার ওপর প্যাচার গুরু গম্ভীর রব। নরকরোটিগুলির মধ্যে দিয়ে বায়ু বাহির হবার সময় বিকট শব্দ হচ্ছে। অশরীরি প্রেতযোনিগুলির ছায়ামূর্তিসমূহ এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখনও বা চোখের পলক ফেলতে না ফেলতে মূর্তিগুলি শ্যাওড়া গাছে উঠে যাচ্ছে। শিষ্য নির্ভীক। কেবল গুরু ধ্যানে বিভোর। চারিদিকে কত নরকঙ্কাল মাটিতে পড়ে রয়েছে। কত যে বিগলিত শবদেহ! দ্বারকা কুলকুল শব্দে বয়ে যাচ্ছে।

গুরু বামদেব তারানাথকে শবের বুকে পদ্মাসনে বসিয়ে, শিষ্যের দেহখানিকে শবের মতো জড়বৎ করে তার সূক্ষ্ম দেহকে আজ্ঞাচক্রের উপর স্থিত ও নিরালম্ব পুরীতে উত্থিত করিয়ে ও রুদ্রগ্রন্থী ভেদ করে উচ্চতর সাধন ক্রিয়ায় নিয়োজিত করলেন। শিষ্য ধন্য ও কৃতকৃতার্থ হলেন। তারানাথ বুঝতে পারলেন তাঁর ভিতরে শক্তিসঞ্চার হয়েছে। তিনি ভাবের ঘোরে গেয়ে উঠলেন,—



শ্মশান ভালোবাসিস বলে, শ্মশান করেছি হৃদি,
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি।
আর কিছু নাই মা চিতে, চিতার আগুন জ্বলছে চিতে,
চিতাভস্ম চারিভিতে একবার এসে দেখিস যদি।'

শবসাধনায় কেটে গেল গোটা রাত। ভোর হল। শিষ্য তারানাথ ফিরে গেলেন গুরুর কাছে। তারপর গোটা একটা দিন ও পুরো রাত তিনি যোগনিদ্রাভিভূত রইলেন। দ্বিতীয়ার ভোরে তাঁর সেই ঘোর কাটল। শয্যা ত্যাগ করে তিনি উঠে পড়লেন। প্র্যাতহিক কাজকর্ম সেরে তিনি বেরলেন পুজোর ফুল তুলতে।

ফুল তুলে ফিরে আসছেন ঠিক সেইসময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল বামাখ্যাপার। গুরু তাঁকে বললেন, দাদা, বিলের ধার থেকে বেরিয়ে এলাম। দেখলাম দক্ষিণ মশানে অনেক কাঠ পড়ে আছে। চট করে সেগুলো নিয়ে আসুন। আগুন জ্বালাতে হবে যে! আজ তো আবার আপনার জন্মদিন। সংস্কার করতে হবে না!

যথাস্থানে ফুল রেখে এসে গুরুর আদেশ পালন করার জন্য তারানাথ দক্ষিণ মশানের দিকে ছুটলেন। সেখানে গিয়ে দেখলেন অনেক আধপোড়া কাঠ পড়ে আছে। কিন্তু কাঠ সংগ্রহ করে ফেরার সময় ঘটল এক বিভ্রাট। দুহাত ও দুই বগলে কাঠ নিয়ে তিনি তখন অনেকটা চলে এসেছেন। এমনসময় একটা বিষধর সাপ তাঁর বাঁদিক থেকে এসে দক্ষিণ দিকে ফণা তুলে দাঁড়াল। দুজনে প্রায় মুখোমুখি। তবে তারানাথ সাপটিকে দেখে একদমই ভয় পাননি। তার মনে হয়েছিল তারামাই বোধহয় তাঁর নাগভূষণকে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য। ফলে ভয় পাওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই! সাপটিকে প্রায় উপেক্ষা করেই আধপোড়া কাঠ নিয়ে তিনি ফিরে এলেন শিমূলতলায় গুরুর কাছে।

কাঠের বোঝা নির্দিষ্ট স্থানে রেখে তারানাথ গুরুকে সেই সাপের কথা জানালেন। কিন্তু অন্তর্যামী, বামদেবের কাছে কিছুই তো অজানা থাকে না। তিনি হাসতে হাসতে বললেন, আপনাকে ওই নাগের সঙ্গে যুদ্ধ করেই আপনার সাধনার পথ পরিষ্কার করতে হবে। চমকে উঠলেন তারানাথ।

তারানাথ বা তারা খ্যাপা একদমই প্রচারবিমুখ ছিলেন। নিজের সম্পর্কে কখনও কারও কাছে কোনও কথা বলতে চাইতেন না। কিন্তু নিজের অন্যতম প্রিয় শিষ্যোর কাছেও কি তিনি নিশ্চুপ থাকতেন! মনে হয় না। পরবর্তীকালে তারাখ্যাপা তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে অবশ্যই অনেক গোপন কথা জানিয়েছিলেন। গুরু বামদেবকে চাক্ষুস দর্শন করার পর তারানাথের কী রকম অনুভূতি হয়েছিল তাঁর খুব সুন্দর বর্ণনা রয়েছে শিষ্য সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'তারাপীঠ ভৈরব' গ্রন্থে। 'অমরনাথে দৃষ্ট আকৃতির সঙ্গে এই

মহামানবের (বামদেব) আকৃতির কল্পনাতীত সাদৃশ্য রয়েছে। মাত্র একদিনের সংসর্গে তিনি বামদেবের মহিমা অনুভব করলেন। গুরুর ঐশ্বরিক শক্তি অজ্ঞাতসারে তাঁর মধ্যে কাজ করতে লাগলো। শিষ্য গুরুসেবায় মনোনিবেশ করলেন।'

আবার ফিরে যাই শিমূলতলায়। সেখানে তখন চরম ব্যস্ততা। যজ্ঞভূমি প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়েছে।



পথ হারিয়ে ফেললেন তারানাথ

শিমূলতলায় শুরু হল হোম। গুরু বামদেব বসেছেন অগ্নিকোণের দিকে মুখ করে, শিষ্য বায়ুকোণে। সংগৃহীত চিতার অর্ধদগ্ধ কাঠ দিয়ে সাজানো হয়েছে হোমের কুণ্ড (স্থণ্ডিল)। জ্বলে উঠল হোমাগ্নি। দুজনেই স্থির হয়ে বসে আছেন বেদির সামনে। আরম্ভ হল চক্রানুষ্ঠান। গুরু শুরু করলেন তাঁর কাজ।

এই অবসরে আমরা খানিকক্ষণের জন্য একটু অতীত থেকে ঘুরে আসি। ফিরে যাই তারানাথের শৈশবের দিনগুলিতে। বাল্যকাল থেকেই দিদিমার প্রবল আদরে প্রমথেশ অত্যন্ত জেদি হয়ে ওঠেন। তাই পুত্রকে শান্ত করার জন্য প্রমথেশের পিতা খুব অল্পবয়সেই তার উপনয়ন দেন। এরপর থেকেই বালক ব্রহ্মচারী মেতে ওঠেন পুজোপাঠে। দিদিমার সঙ্গে নিয়মিত গৃহদেবতার পুজো করতে শুরু করেন। সময় সময় তিনি এমন গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন যে তাঁর বাহ্যজ্ঞান থাকত না। অল্পবয়স থেকেই তিনি ব্যাঘ্র চর্মের আসনে বসেই পুজো করতেন। একদিন ঘটল সেই অসাধারণ ঘটনাটি। পুজোয় বসেছেন প্রমথেশ। দেখতে দেখতে অনেকটা সময়ও কেটে গেছে। তিনি অলৌকিক ভাবে সেদিন মন্ত্র পেলেন। অষ্টাদশ অক্ষরের মন্ত্র।

আবার ফিরে আসি শিমূলতলায়। দিনটা ছিল ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, আদিত্যবার। গুরু বামদেব এবার কী করলেন! নিজের মুখটি প্রমথেশের কানের কাছে নিয়ে গিয়ে শিষ্যের শৈশবে পাওয়া অষ্টাদশ অক্ষরের মন্ত্রটি শুনিয়ে বললেন, দাদা, আপনি কিশোর বয়সে এই মন্ত্রটি লাভ করেছিলেন?

শিষ্য সম্মতি জানানো মাত্রই গুরু সেই মন্ত্র থেকে পাঁচটি অক্ষর বাদ দিয়ে শুধু তেরোটি অক্ষর রাখলেন। তারপর দক্ষিণাস্বরূপ শিষ্যের সঙ্গী লাঠিটি চেয়ে নিয়ে বললেন, আপনি এবার স্নান করে এসে পূর্ণকুম্ভে আদিত্যের উপাসনা করুন।

সেদিনই বামদেব শিষ্যের পিতৃদত্ত নাম বদলে নতুন নামকরণ করলেন ব্রহ্মচারী তারানাথ। এবং অল্পদিনের মধ্যে তারানাথ থেকে তিনি হয়ে গেলেন তারা খ্যাপা।

তারাপীঠে শুরু হল বড় ও ছোট দুই খ্যাপার রাজত্ব। তাঁরা দু'জনে কেউ কাউকে ছাড়া একমুহূর্ত থাকতে পারতেন না। আর শিষ্যেরও ছিল অসীম গুরু ভক্তি। অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখছেন, 'তারানাথের গুরু ও ইষ্টের প্রতি নিষ্ঠা, ভক্তি দশরথের সহিত তুলিত হতে পারে। রাজা দশরথ বলেছিলেন, ত্র্যম্বক ভিন্ন আমি কাহারও উপাসনা করি না। তারানাথ বামদেব ভিন্ন চতুর্দশ ভুবনে কাহাকেও মানিতেন না, কাহারও নিকট মাথা নোয়াতেন না। তিনি বলতেন বামদেবের কাছে মাথা বেচেছি, কার কাছে আবার মাথা নোয়াবো? গুরুও শিষ্যকে অভিন্ন ভেবে প্রাণঢালা ভালোবাসতেন।'

অসম্ভব ভালোবাসলেও গুরু কিন্তু নানাভাবে শিষ্যের পরীক্ষা নিতেন। সোনাকে পুড়িয়ে যেমনভাবে খাঁটি করতে হয় ঠিক সেইভাবেই শিষ্যকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন বামদেব। একদিন তিনি শিষ্যকে ডেকে

বললেন, দাদা, আপনাকে তো এবার সাধনায় বসতে হবে!

শিষ্য বললেন, আদেশ করুন।

গুরু বললেন, চর্তুদিকে আগুন জ্বেলে আপনাকে টানা উনিশ দিন তপস্যা করতে হবে।

হঠযোগী শিষ্য গুরুর আদেশ শিরোধার্য করে তপস্যায় বসলেন। তপস্বী তারানাথকে পরবর্তীকালে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন, 'মানুষের সাধ্য কি সকল ভ্রম নাশ করে, জ্ঞান প্রকাশ করে। অগ্নি ভিন্ন দ্বিতীয় কারও ক্ষমতা নেই যে স্থূল দেহকে নিষ্পাপ ও শুদ্ধ করে নেয়। একমাত্র যিনি পারেন তিনি গুরু ব্রহ্ম, যো জানে অগ্নি ব্রহ্ম কা ভেদ, সোই ঈশ্বর সোই দেব। পিতা বামই সেই পুরুষ যিনি অগ্নিসম পরমব্রহ্ম, জ্যোতিঃ স্বরূপ আত্মা। তিনি ভিন্ন শুদ্ধ সৎ করে নিতে, পথ দেখাতে আর কে পারেন?'

বড়মাকে নিয়ে দিব্য আছেন দুই খ্যাপা। একদিন বিকেল বেলায় বামদেব শিষ্যকে ডেকে বললেন, দাদা এখনিই একবার আপনাকে রামপুরহাটের অধ্যাপক জিতেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে যেতে হবে। করণীয় সমস্ত কিছুই তিনি শিষ্যকে বুঝিয়ে দিলেন। তারানাথও রওনা হলেন রামপুরহাটের উদ্দেশে এবং পদব্রজে। শুধু গুরু নয় গুরুস্থানের প্রতি তাঁর ছিল অসীম ভক্তি। তাই তিনি কখনও গোরুর গাড়িতে চেপে এই পথে যাতায়াত করতেন না। পায়ে হেঁটেই তিনি তাঁর সমস্ত কাজকর্ম সারতেন। সেদিনও শুরু হল তাঁর পথচলা।

রামপুরহাটে যখন তারানাথ পৌঁছলেন তখন সন্ধে নামতে আর দেরি নেই। জিতেনবাবুর সঙ্গে কথাবার্তা সারতেও তাঁর বেশ খানিকটা সময় লাগল। কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর তিনি হঠাৎই গুরুর আকর্ষণ অনুভব করতে লাগলেন। তাই আর একমুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জিতেনবাবুকে বলে আবার পথে নামলেন। আবার সেই একই পথে ফেরা। পার হতে হবে চিলি ও দ্বারকা নদী।

নদী দুটি নির্বিঘ্নেই পার হলেন। তারপরই শুরু হল সমস্যা। ঝুপ করে নেমে এল রাত্রি। একদম ঘুটঘুটে অন্ধকার। মুশকিল হল সরলপুরের মাঠ পার হওয়ার সময়। জিতেনবাবুর বাড়ি থেকে একটা লণ্ঠন চাইতেও ভুলে গেছেন। পথ হারিয়ে ফেললেন তারাপীঠের ছোট খ্যাপা তারানাথ। একই পথে অবিরাম ঘুরে চলেছেন বামদেবের প্রিয় শিষ্য, বড়মার ছোট সন্তান!



তারানাথ ও পিশাচ

বামদেব হাসছেন, শিশুর মতো খিল খিল করে হাসছেন। উপস্থিত ভক্ত ও পাণ্ডারা বাবার কাণ্ড দেখে অবাক। এক ভক্ত সাহস করে জিজ্ঞেস করলেন, বাবা, কী হয়েছে! আপনি এরকম হাসছেন কেন?

উত্তরে বামদেব হাসতে হাসতেই বললেন, দাদা আসছেন, কিন্তু সরলপুরের মাঠে তাঁকে পিশাচে গিলতে চেষ্টা করছে। উপস্থিত কেউই বাবার এই কথার অর্থ সেই মুহূর্তে বুঝতে পারলেন না। বিষয়টা পরিষ্কার হল তারানাথ তারাপীঠে ফিরে আসার পর।

গুরু তখনও শিষ্যের অপেক্ষায় বসে আছেন শিমূলতলায়। দাদা তারানাথ সেখানে আসা মাত্র বামদেব বললেন, কী আজ তো খুব বিপদে পড়েছিলেন! জাল কাটতে সমস্যা হয়নি নিশ্চয়!

উত্তরে তারানাথ বললেন, হ্যাঁ কর্তা, এ তো তোমারই খেলা! আবার একটা পরীক্ষা নিলে আমার।

বামদেব হাসতে হাসতে আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। শিষ্যের কাঁধে হাত রেখে বললেন, আজ আপনার অনেক পরিশ্রম হয়েছে। চলুন এবার একটু বিশ্রাম করে নিন। কাল থেকে আমাদের কিন্তু অনেক কাজ করতে হবে!

দিনের সূচনা হল। এবার শক্তি বদলের পালা। তারাপীঠের সচল ভৈরব বামদেব তাঁর সমস্ত শক্তি সঞ্চারিত করবেন তাঁর শিষ্যের মধ্যে। বহুদিন আগে কৈলাসপতি ব্রজবাসী বাবা তাঁকে শিখিয়েছেলেন মৃতকে জীবিত করার শিক্ষা। শুকনো তুলসী গাছকে 'তুলসী জিও' মন্ত্র দিয়ে তিনি আবার বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। গুরুর কাছ থেকে একদিন যা শিখেছিলেন আজকের সকালে সেই অধিবিদ্যা বামদেব শেখাবেন তাঁর অন্যতম প্রিয় শিষ্য তারানাথকে।

শিষ্যের ওপর অগাধ ও অটল বিশ্বাস ছিল গুরুর। তিনি জানতেন অকারণে বা নিজের ক্ষমতা জাহির করার জন্য এই দৈবী শক্তি তারানাথ কখনই ব্যবহার করবেন না। তাই তিনি সবকিছু উজাড় করে ঢেলে দিলেন শিষ্যের ঝুলিতে।

তারানাথ কখনই নিজের ক্ষমতা, বা আমি কতবড় সাধক তা দেখাবার কিংবা জানানোর জন্য কোনওদিনই গুরু প্রদত্ত ক্ষমতার অপব্যবহার করেননি। তাছাড়া তিনি নিজের ঢাক পেটাতে একদমই ভালোবাসতেন না। তবে এই অধিবিদ্যা কী তিনি কোনওদিন ব্যবহার করেননি! অবশ্যই করেছেন, তবে সেটা লোকহিতার্থে, কারও মঙ্গলের জন্য।

একবার এক সাপে কাটা ছেলেকে বাঁচিয়েছিলেন তারা খ্যাপা। অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, 'একটি অলৌকিক ঘটনা জুড়নপুর নিবাসী স্বর্গত হরিপদ মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রীর নিকট আমরা শুনেছি। কেতো নামে একটি বারো বছরের ছেলেকে সাপে কামড়েছিল। নবদ্বীপের নিকটবর্তী কাষ্ঠশালীর ঘাটে তার বাবা

ধুবুলিয়া নিবাসী স্বর্গত হেমন্তকুমার মৌলিক কলাগাছের ভেলায় শুইয়ে সর্পদষ্ট পুত্রকে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। হরিপদ মৈত্র মহাশয়ের স্ত্রী বললেন, ছেলেটিকে রোজারাও বাঁচাতে পারেনি। তারানাথ তাকে জল থেকে তুলে এই নির্জন পীঠে এনে বাঁচিয়ে নিজের নিকটেই রেখে দেন। আমরা এ বিষয়ে অনুসন্ধানের পর জানতে পারি যে সেই পুত্র যৌবনপ্রাপ্ত হলে গুরুর আদেশে কিরীটিপীঠে যাবার পথে নিজ জন্মভূমিতে একদিন সন্ধ্যায় অতিথি হয়েছিলেন। তাঁর পিতা অনেক অনুনয়-বিনয়, কান্নাকাটি করেও অতিথির প্রকৃত পরিচয় আদায় করতে পারেননি। এ বিষয়ে পুত্রের পিতা তারানাথবাবার নিকট গেলে তিনি বললেন, জীবিতাবস্থায় তো আমাকে দাওনি, মরা ছেলে আমি নিয়ে থাকি তো থানা পুলিশ আছে যাও।'

এই রকম বহু ঘটনা তারা খ্যাপা তাঁর জীবদ্দশায় ঘটিয়েছেন। বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র হঠাৎই মারা গেলেন। তাঁকে নিয়ে আসা হল শ্মশানে দাহ করার জন্য। তারানাথ তখন শবসাধনায় বসেছেন। যুবকের মায়ের ক্রন্দনে সাধকের মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি শবের বুকে বসেই মৃত যুবকের শরীরে প্রাণসঞ্চার করলেন। মৃত যুবক উঠে বসলেন খাটে। এই ঘটনা ঘটার পর সেই যুবকের মা পুজোর জন্য দু-বোতল উৎকৃষ্ট কারণ তারানাথের হাতে তুলে দেন। সকাল হওয়ার পর শিষ্য সেই বোতল দুটি গুরুর সেবায় নিবেদন করেন। গুরু সেই বোতল থেকে কিছুটা পানীয় নিজের গলায় ঢেলেই শিষ্যকে বললেন, দাদা! মদ বদ, মড়ার গন্ধ কইচে, খায়ে না। সেইদিন থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তারানাথবাবা কখনও কারণ খাননি এবং স্পর্শ পর্যন্ত করতেন না।

বামদেবের সুদীর্ঘকালের সাধনসঙ্গী ও স্নেহধন্য পরমশ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ পাণ্ডা মহাশয় তারা খ্যাপার অলৌকিক ঘটনার সাক্ষী ছিলেন। তিনি তাঁর স্নেহধন্যদের কাছে বলতেন, তারানাথ উগ্রতাপস ও মহাযোগী ছিলেন। তিনি পায়ে হেঁটে (কখনও নিজেকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য করে) গঙ্গা পার হয়ে যেতেন। একই রাত্রে তারাপীঠ থেকে জুড়নপুর শ্মশানে যাতায়াত করতেন। একদিন কৃষ্ণনগরের খড়ে নদী পার হওয়ার জন্য তারানাথ বাবা ও আমি একসঙ্গে নৌকায় উঠলাম। কিন্তু নৌকো ওপারে পৌঁছবার পর দেখি বাবা আগে থেকেই তীরে দাঁড়িয়ে আছেন। বাবাকে জিগ্যেস করলাম, কিন্তু তিনি হু-হাঁ করে ব্যাপারটা এড়িয়ে গেলেন।

সাধনার পাশাপাশি তারা খ্যাপা অদূর ভবিষ্যতে দেশকে ব্রিটিশ শাসকদের হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামেও ব্রতী হবেন। ব্রিটিশ শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে উঠবেন তিনি। তাঁকে কাটাতে হবে বন্দি জীবনও।



তারানাথের রোষে কপাল পুড়ল ম্যাজিস্ট্রেটের

ইংরেজ শাসকদের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিলেন বড়মার জ্যেষ্ঠ সন্তান বামদেবের প্রিয় শিষ্য তারানাথ বা তারা খ্যাপা। এই প্রসঙ্গে ডাক্তার অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় লিখছেন, 'তন্ত্রসাধকগণ ধরিত্রী বা বসুন্ধরাকে আপন ইষ্ট মাতৃকাস্বরূপেই দেখে থাকেন। ক্ষ্যাপাজি তারানাথ বলতেন, 'মাটি মা। এই মা তোমার আমার সকল জীবের পুষ্টি সাধন করেন, আরও দেন আয়ু, আরোগ্য, কান্তি, বল, মেধা, স্মৃতি।' মাতৃরূপা ভারতবর্ষ ছিল তাঁর কাছে ধ্যানের বিষয়। বিদেশি, বিধর্মী কর্তৃক মাতৃভূমির স্বাধীনতা হরণকে তিনি অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করতেন। মাতৃভূমির মুক্তির জন্য তারানাথ গুরু বামদেবের নির্দেশ লাভ করেন। তাই সাধক তারাখ্যাপা স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগণ্য নায়করূপে দেখা দেন এবং একাধিকবার কারাবরণ ও অন্তরীণ হন।'

বড়মার ছোট সন্তান তারা খ্যাপা চিরকালই সশস্ত্র আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। ১৯০৩ থেকে ১৯০৭ সাল পর্যন্ত তারানাথ বিপ্লবীদলের ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বারীন্দ্রনাথ ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে একযোগে কাজ করেন। তাঁর লেখা ব্রিটিশ বিরোধী বেশ কিছু সাড়াজাগানো প্রবন্ধ এইসময়ে তৎকালীন সন্ধ্যা ও যুগান্তর পত্রিকায় নিয়মিত প্রকাশিত হত। ফলে সিদ্ধ সাধক হওয়া সত্ত্বেও ইংরেজ সরকার তাঁর গতিবিধি ও কাজকর্মের ওপর কড়া নজরদারি চালাত।

ব্রিটিশ রাজশক্তি এই নজরদারি চালাবার জন্য তাঁদের দুজন দুঁদে পুলিশ অফিসারকে নিয়োগ করেছিলেন। তাঁরা হলেন আহম্মদ হোসেন (তিনি পরে রাঁচির ডিএসপি হন) ও কলকাতা পুলিশের অন্যতম কর্তা পূর্ণ লাহিড়ী। মজার ব্যাপার হল পূর্ণবাবু আবার তারা খ্যাপাকে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা করতেন। এই দায়িত্ব পেয়ে তিনি বেজায় বিব্রত হয়ে পড়েছিলেন।

শহিদ বাঘা যতীনের সহকর্মী, বিপ্লবী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ভূপতি মজুমদার মহাশয়ও তারা খ্যাপার অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি যখন খুব ছোট সেইসময় তিনি তাঁর মামারবাড়িতে প্রথম তারা খ্যাপাকে দর্শন করেন। তাঁদের সেই সম্পর্ক সারাজীবনই অটুট ছিল। একবার এই সাধক সম্পর্কে একজায়গায় তিনি বলেছিলেন, '১৯০৩ সাল। তখন আমার বয়স মাত্র দশ বৎসর। সেই সময় আমি তারাখ্যাপা বাবার সান্নিধ্যে আসি। খ্যাপাবাবা আমার মাতুল হুগলির উকিল শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধায়ের বাড়িতে বৎসরে দুই, চার বার বা ততোধিক বার আসতেন। এই সময় উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হুগলিতে কয়েকজন শিক্ষিত যুবককে নিয়ে একটা রাজনৈতিক দল তৈরি করবার চেষ্টা করছিলেন। এইসব যুবকদের সঙ্গে তারাখ্যাপাবাবা রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করতেন যে সশস্ত্র বিদ্রোহ ছাড়া অন্য কোনও উপায়ে ইংরেজকে এদেশ থেকে তাড়ান সম্ভব নয়।'

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। সারা পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর হাহাকার। সমগ্র বিশ্ব তখন যুদ্ধের উত্তাপে উত্তপ্ত। ঠিক সেইসময় স্বরূপগঞ্জ আশ্রম থেকে তারা খ্যাপাকে গ্রেপ্তার করল ইংরেজ পুলিশ বাহিনী, এবং বিনা বিচারে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নোয়াখালি জেলার হাতীয়া দ্বীপে। সেখানেই তারা খ্যাপা অন্তরীণ অবস্থায় রইলেন।

ডাক্তার চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'সিদ্ধসাধক তারাক্ষ্যাপা' গ্রন্থের এক জায়গায় লিখছেন, 'এই অন্তরীণ থাকাকালীন সুন্দরবন গোসাবা এস্টেটের চিকিৎসক ডাক্তার শ্রী অশ্বিনীলাল রায় তারানাথের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমাকে এক পত্রে লিখেছেন, ১৯১৬-১৭ সালে সন্দ্বীপে আমি যখন নজরবন্দি থাকি তখন খ্যাপাবাবাও নোয়াখালি জেলার হাতীয়া দ্বীপে নজরবন্দি থাকেন। কিছুদিন থাকার পর খবর পেলাম দারোগা চক্রবর্তী মহাশয়ের বাড়িতে এক দাসী কাজ করত। এই দাসীর একমাত্র পুত্র কলেরা হওয়ায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্রশোকাতুরা মা ছুটে এসে খ্যাপাবাবার পা দুটি জড়িয়ে ধরে।'

এরপরই ঘটল সেই মহা অলৌকিক ঘটনাটি। তারা খ্যাপা ছেলেটিকে দেখতে গেলেন। একটি বিছানার ওপর মৃতবৎ শুয়ে ছিল সেই ছেলেটি। তারানাথ ঘরে ঢুকেই তাঁর হাতের লাঠিটা দিয়ে সজোরে ছেলেটির মাথায় আঘাত করলেন। মাথাটা ফেটে গেল। এই দৃশ্য দেখে ছেলেটির মা জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। দারোগা শ্রীচক্রবর্তী প্রথমে স্থানীয় ডাক্তারকে ডেকে প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়ে রুগি ও তার মাকে নোয়াখালি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে খ্যাপাবাবার নামে নালিশ ঠুকলেন।

ছেলেটি সদর হাসপাতালে পৌঁছবার পর সেখানকার চিকিৎসক ছেলেটির মাথার ব্যাণ্ডেজ খুলে কোনও আঘাতের চিহ্ন বা ক্ষত দেখতে পেলেন না। শুধু তাই নয়,ছেলেটির কলেরার প্রকোপও ক্রমশ কমতে শুরু করল।

দিনকয়েক বাদে এই ঘটনার তদন্ত করতে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ সাচী। তিনি পৌঁছলেন এক বড়সড় বাহিনি নিয়ে। সেই দলে ছিলেন পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট মহম্মদ টুনি মির্জা, আই বি ইনস্পেক্টর শরৎ দাস ও সার্কেল ইনস্পেক্টর মিঃ সেন।

শুরু হল জেরা। এইসময় মিঃ সাচী তারা খ্যাপাকে কিছু রূঢ় কথা বলে বসলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে খ্যাপাবাবা সিংহনিনাদে গর্জন করে উঠলেন। তাঁর মাথার চুলগুলো খাড়া হয়ে উঠল, চোখ দিয়ে যেন আগুনের হলকা বেরোতে লাগল। সেই হলকায় মিঃ সাচীর মাথার সামনের দিকের অনেকটা চুল পুড়ে কপালে কালো কালো দাগ পড়ে গেল। এই ঘটনায় উপস্থিত সকলেই স্তম্ভিত ও হতবাক হয়ে পড়েছিলেন। মিঃ সাচীও নতজানু হয়ে 'ও ক্রাইস্ট! ও ক্রাইস্ট!' বলে চিৎকার করে উঠলেন।

একটু সামলে নিয়ে মিঃ সাচী বলেছিলেন, 'আমি ছোটবেলায় ভারতীয় সাধুদের অনেক অলৌকিক কাহিনি শুনেছি। কালচক্রে ভারতীয় অসামরিক চাকরিতে যোগদান করে আমি ভারতে আসি। ইচ্ছে ছিল, ভারতের সত্যিকারের সাধুকে দর্শন করব। আজ আমার সে সাধ পূর্ণ হল।'

অন্তরীণ থেকে ফিরে আসার পর তারা খ্যাপার অনেক ভক্তই তাঁর কাছে জানতে চাইতেন, কেন এবার তাঁকে বন্দি করা হয়েছিল! উত্তরে তারানাথ বলতেন, 'বাঘা যতীনকে বিপ্লবের কাজে সাহায্য করাই বোধহয় ইংরেজ রাজের এই ভীতির কারণ।'



তারাখ্যাপা, মাতাজি ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র

১৮৩৫ সাল। প্রসিদ্ধ রায় বেলর দুর্গ। এই দুর্গের কোনও এক কক্ষে মাতাজি গঙ্গাবাঈ প্রথম পৃথিবীর আলো দেখেন। দাক্ষিণাত্যের আর্কট প্রদেশের রাজা যোগীরাজের বংশের রাজকন্যা ছিলেন মাতাজি। রাজপরিবারে জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ছোট থেকেই ভোগবিলাসের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ ছিল না। রাজকন্যা হওয়ার ফলে তাঁকে রাজবংশের নানাবিধ নিয়মকানুন মেনেই চলতে হত। তাসত্ত্বেও তিনি বিদ্যাচর্চার পাশাপাশি নিয়মিত শরীরচর্চাও করতেন। সংস্কৃত ভাষার ওপর তাঁর দখল ছিল অপরিসীম। চিরকুমারী থাকার সংকল্প নিয়ে তিনি পঞ্চাগ্নিব্রতও পালন করেছিলেন।

খ্যাপাজি তারানাথ বলতেন, 'মহাকালী পাঠশালায় মাতাজি রচিত অনেক প্রবন্ধাদি ছিল। মাতাজি তাঁর ভক্ত ও অনুরাগীদের যোগাবশিষ্ঠ রামায়ণ পড়ার উপদেশ দিতেন। তিনি অশ্বচালনা এবং অস্ত্রচালনায় বিশেষ পটু ছিলেন।'

১৯০২ সাল। পুণ্যতীর্থ কাশীধামে মাতাজি গঙ্গাবাঈ-এর সঙ্গে আলাপ হল সিদ্ধ তান্ত্রিক তারানাথের। সাধকের অগাধ পাণ্ডিত্য ও দেশের প্রতি প্রবল ভালোবাসা দেখে মাতাজি খুবই খুশি হয়েছিলেন। তারপর তিনি জানতে পারেন সাধক তারাখ্যাপা সাধক বশিষ্ঠদেব ও বামদেবের সিদ্ধাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। ফলে অল্পদিনের মধ্যে তারাবাবা মাতাজির অত্যন্ত প্রিয় হয়ে ওঠেন। তাঁরই হাত দিয়ে মাতাজি বালেশ্বরের মহাবিদ্রোহে বাঘা যতীনকে অর্থসাহায্য পাঠাতেন। আর তারই ফলস্বরূপ মাতাজি গঙ্গাবাঈয়ের মতো তারাখ্যাপাও ইংরেজ শাসকদের চক্ষুশূল হয়ে ওঠেন।

সাধনজীবনে তারাখ্যাপা এই মহাতপস্বিনী সাধিকার সান্নিধ্যে এসে যথেষ্ট উপকৃত হয়েছিলেন। অগস্ত্যকূট পর্বতে কন্দমূল খেয়ে মাতাজির আশ্রয়ে থেকে তারাখ্যাপা পঞ্চাগ্নি বিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করেন। তারপরেও তাঁরা একসঙ্গে বহুদিন সাধন-ভজন করেন।

বিন্ধ্যাচল পর্বত থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত বিন্ধ্যবাসিনী মন্দির। এই পর্বতমালার পাদদেশেই 'কালিখো' মন্দির। পর্বত ও অরণ্য বেষ্টিত এই স্থানটি তন্ত্রসাধকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় সাধনভূমি। আশেপাশে লোকালয় নেই বললেই চলে। ফলে নিশ্চিন্তে নরবলি পর্যন্ত দেওয়া যেত। বহু সাধক এই স্থানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন। এই মন্দিরে মাতাজি ও তারানাথ একসঙ্গে দীর্ঘদিন সাধন-ভজন করেছেন। শুধু তাই নয় তাঁরা দুজনে বহুদিন জুড়নপুরেও একত্রে সাধনা করেছিলেন।

সাধন-ভজনের ব্যাপারে তারাখ্যাপা অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ হলেও, দেশকে শৃঙ্খল মুক্ত করার কাজেও তিনি সমান উৎসাহী ছিলেন। বিপ্লবী দলের বহু মানুষের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ

নেওয়া প্রথম সারির প্রায় সব নেতাই তারাখ্যাপাকে প্রবল শ্রদ্ধা করতেন। বিশেষ করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর সঙ্গে তারাখ্যাপার প্রায় বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল, এবং তাঁরা ছিলেন একই পথের পথিক।

নেতাজির অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সহযোগী শশাঙ্কশেখর সান্যাল মহাশয়ের একটি লেখা থেকে দুজনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা খানিকটা আঁচ করা যায়। তিনি লিখছেন, 'ভিয়েনা প্রসঙ্গে খ্যাপাবাবাকে প্রশ্ন করলে ইশারায় তিনি যা ব্যক্ত করেন তাতে মনে হয় যখন বিঠলভাই প্যাটেলের রোগশয্যার পাশে শুশ্রূষারত সুভাষ উদ্বিগ্ন ও বিপন্ন বোধ করছিলেন সেই সময় শ্রীমৎ খ্যাপা সুভাষের অতি সন্নিকটে ছিলেন (এই উপস্থিতি কায়িক নয়)। পরবর্তীকালে সুভাষের কাছে এই প্রসঙ্গ তুললে কোনও প্রতিবাদ পাইনি, এবং আমি যদি ভুল না বুঝে থাকি তবে যা পেয়েছি সেটা সমর্থনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।' (সুভাষ প্রসঙ্গে শশাঙ্কশেখর সান্যাল, 'সাপ্তাহিক যুগবাণী', ২৩ নভেম্বর ১৯৬৩ হইতে উদ্ধৃত)।

এই প্রসঙ্গে আর একটি ঘটনার কথা অবশ্যই উল্লেখ করার প্রয়োজন আছে। ১৯৩৯ সালের ৩০ নভেম্বরের কথা। বেলডাঙ্গায় কর্মী অনুষ্ঠান সেরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র সবে তাঁর ঘনিষ্ঠ বহরমপুরের শশাঙ্কবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছেন। এমনসময় শশাঙ্কশেখরের এক প্রতিবেশী ব্যবসায়ী যোগেন্দ্রপদ ভট্টাচার্য তাঁদের বাড়িতে এসে তাঁর হাতে গালা দিয়ে মুখ বন্ধ একটি খাম দিয়ে বললেন, তারানাথবাবা এই চিঠিটা এখনিই নেতাজিকে দিতে বলেছেন।

শশাঙ্কবাবু সঙ্গে সঙ্গেই চিঠিটা নেতাজির হাতে দিয়ে বলেছিলেন, শ্রীমৎ তারাখ্যাপা আপনাকে এই চিঠিটা পাঠিয়েছেন। খামটা হাতে নিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকার পর জানতে চাইলেন, তারাখ্যাপা বেঁচে আছেন? তিনি কোথায় থাকেন? আমি আজই তাঁর সঙ্গে দেখা করব।

উত্তরে, সান্যাল মহাশয় বলেছিলেন, তারাখ্যাপা এই শহরের প্রান্তে নিজের আশ্রমে থাকেন। আপনি যখন বিকেলে লালবাগ যাবেন তার আগে যাতে বাবার সঙ্গে আপনার দেখা হয় তার চেষ্টা করব।

নেতাজি এরপর খামটা খুলে চিঠিটা বের করলেন। লাল পেনসিলে লেখা বিষয়বস্তুর ওপর চোখ বুলিয়ে তিনি চিঠিটা শশাঙ্কবাবুর হাতে তুলে দিয়ে বলেছিলেন, দেখুন তো এটা উদ্ধার করতে পারেন কিনা?

কী লেখা ছিল সেই ছোট্ট চিঠিতে?

সুভাষ বসু,

৫/৬ বৎসর পূর্বে একদিন ভিয়েনার কথা মনে কর। পদ চুম্বন ধর্ম নয়। ইন্দ্রকে 'গোত্রভিৎ' বলে, আর বলদেবকে 'যমুনাভিৎ'। তুমি কিছু ভেদ করেছ? অষ্টবজ্র মিলন কাল এসে গেছে। কোথায় কার উদ্যেশে যাইতেছ?

তোমাদের X'

সেবার নেতাজির সঙ্গে খ্যাপাবাবার দেখা হয়নি। কারণ তিনি তাঁর বহরমপুরের 'উমাবনম আশ্রমে ছিলেন না। পরবর্তীকালে নেতাজির নির্দেশমতো শশাঙ্কবাবু শ্রীমৎ খ্যাপাবাবার কাছে গিয়ে অষ্টবজ্র সম্মেলনের অর্থ জানতে চেয়েছিলেন। তারানাথ শশাঙ্কবাবুর হাত থেকে চিঠিটা টেনে নিয়ে তাঁর প্রান্তভাগে লিখে দিয়েছিলেন 'তোমার কর্মক্ষেত্র ইউরোপের রণাঙ্গনে, সেখানেই তোমাকে যেতে হবে'।

এই মহান তন্ত্রসাধক ও দেশের বীর সেনানী শ্রীমৎ তারাখ্যাপা ১৯৪৫ সালের ৬ ডিসেম্বর, বৃহস্পতিবার, বিকেল পাঁচটা পনেরো মিনিটে গুরুমুদ্রা ধারণ করে মরদেহ ত্যাগ করেন। ভক্তরা শোকে ভেঙে পড়লেন। কিন্তু তিনিই তো আমাদের দিয়ে গেছেন সেই চমৎকার অভয়বাণী 'আমি সপ্তভূমি, গ্রীষ্মময় পুরী, বর্ষাময়পুরী, হিমালয়পুরী অতিক্রম করে বশিষ্ঠ ঋষির মত স্বদেহে পুনরায় ফিরে আসব।' তাহলে আর চিন্তা কিসের!



লোকনাথজির আশীর্বাদে ভেঙ্গু বেকসুর খালাস পেলেন

একদিকে ভবানী ঘাট অন্যদিকে বারদী বাজার। আর তার ঠিক মধ্যিখানে একখণ্ড জমি। জমিদার নাগ মশাইয়ের সম্পত্তি। একসময় এইখানেই দাহকার্য সম্পন্ন হত। বর্তমানে জমিটি আর শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। পতিত অবস্থায় পড়ে আছে। এদিকে মহাসাধক লোকনাথ ব্রহ্মচারীর অবস্থাও তেমন ভালো যাচ্ছে না। যে মানুষটি তাঁকে গুরুপদে বসিয়ে বারদীতে নিয়ে এসেছিলেন সেই ভেঙ্গু কর্মকার কিছুদিন আগেই মারা গেছেন। আর তারপর থেকেই শুরু হয়েছে যত অশান্তি। নগ্ন সন্ন্যাসী বাড়ির সর্বত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন,যখন-তখন লোকজন চলে আসছেন বাড়িতে, মহিলাদের 'প্রাইভেসি' বলে তো আর কিছুই অবশিষ্ট থাকছেনা। ভেঙ্গু যখন ছিলেন তখনও বাড়ির অনেকেই এই সাধুকে মোটেই ভালো চোখে দেখতে পারতেন না। বিশেষ করে মহিলারা। আর এখন তো বাড়ির কর্তা ভেঙ্গুই নেই। ফলে যা হওয়ার তাই হল। একদিন বাড়ির সবাই মিলে লোকনাথজির ঘরে ঢুকে বললেন, দেখুন, আমাদের এখন ঘরের বড়ই অভাব, তাছাড়া সংসারের অবস্থাও মোটেই ভালো নয়, নুন আনতে পান্তা ফুরিয়ে যাচ্ছে। তারফলে আমরা এখন আর বাড়তি বোঝা টানতে পারছি না। লোকনাথ ব্রহ্মচারী নিজের আসনে বসে ছিলেন। তাঁদের কথা শুনে উঠে দাঁড়িয়ে মৃদু হেসে বললেন, তোমরা আমাকে চলে যেতে বলছ তো? বেশ তাই হবে। আমি এখনিই চলে যাচ্ছি। তবে ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন। আবার পথে নামলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

সেইসময় লোকনাথজি ত্রিপুরার দাউকান্দি গ্রামে অবস্থান করছেন। সেইখানেই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল বারদীর ভেঙ্গু কর্মকারের। মিথ্যে ফৌজদারি মামলায় জড়িয়ে দিয়েছিলেন তাঁরই নিকট আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা। ভেঙ্গু দাউকান্দি গ্রামে এসেছিলেন তাঁরই এক আত্মীয়ের কাছ থেকে মামলার টাকা জোগাড় করতে। ফেরার সময় তাঁর সঙ্গে দেখা হল শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর। তিনি তখন একটি বটগাছের নীচে চুপ করে বসে ছিলেন। তাঁকে দেখেই ভেঙ্গু ছুটে এসে তাঁর পাদুখানি জড়িয়ে ধরে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, বাবা, আমাকে বাঁচান। গরিব মানুষ আমি, যা অবস্থা তাতে আমার দু-বছর জেল হবেই। আমার পরিবার পথে বসে যাবে।

লোকনাথজি ভেঙ্গুর মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ওঠ, উঠে বোস। তোর কিছুই হবে না। তুই নিশ্চিন্তে বাড়ি ফিরে যা।

মামলায় রায় বেরল। ভেঙ্গু বেকসুর খালাস পেয়ে গেলেন। আদালত থেকে বাড়ি নয়, ভেঙ্গু চললেন দাউকান্দি। আবার দেখা হল ভক্ত ও ভগবানের। তিনি ওই বটগাছের নীচেই বসেছিলেন। ভেঙ্গু আবার লুটিয়ে পড়লেন ভগবানের চরণে। বললেন, আর তোমাকে আমি ছাড়ব না। তোমাকে আমার সঙ্গে বারদী যেতে হবে।

একদিন ভেঙ্গুর কাতর অনুরোধে তিনি দাউকান্দি থেকে বারদীতে এসেছিলেন। আজ সেই ভেঙ্গুর পরিবারের অন্য সদস্যদের আদেশে তিনি কর্মকার গৃহ ছেড়ে রাস্তায় নামলেন। আবার তাঁর পথ চলা শুরু হবে।

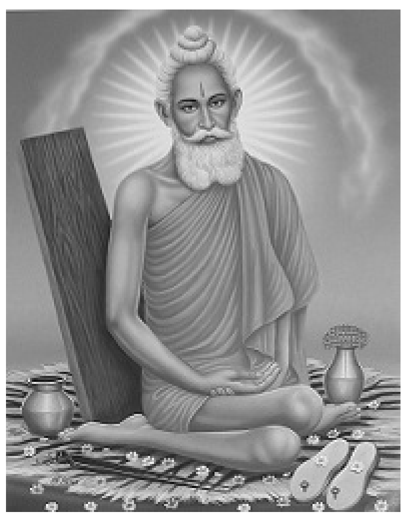
কিন্তু 'স্বয়ং ঈশ্বর' লোকনাথ ব্রহ্মচারী বারদী ছেড়ে চলে যান তা মোটেই চাইলেন না সর্বশক্তিমান শ্রীভগবান। লোকনাথজির পথরোধ করে দাঁড়ালেন বারদীর অন্যান্য মানুষজন। সেই সমাবেশের একদম সম্মুখভাগে দাঁড়িয়েছিলেন নাগ জমিদারবাড়ির বেশ কয়েকজন কর্তা। তাঁরাই কথা শুরু করলেন। বললেন, আপনি বারদী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না।

লোকনাথজি মৃদু হেসে বললেন, আজ আমি ভেঙ্গুর বাড়ি থেকে বিতাড়িত হয়েছি। আমি সন্ন্যাসী, আমি আর কোনও গৃহীর বাড়িতে থাকতে পারব না।

নাগ জমিদারবাড়ির এক সদস্য বললেন, আপনার ইচ্ছার কথা শুধু আমাদের জানান। তারপর আমরা দেখছি কী করা যায়!

লোকনাথজি বললেন, আমাকে তোমরা একখণ্ড জমির ব্যবস্থা করে দাও। সেখানে আমি একটা আশ্রম তৈরি করব। তবে মনে রেখ, আমি তোমাদের কোনওরকম কর দিতে পারব না।

নাগ কর্তা কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বললেন, সেই রকম একটা জমির ব্যবস্থা আমরা আপনাকে করে দিতে পারব। ভবানী ঘাটের কাছে পতিত অবস্থায় জমিটি পড়ে আছে। একসময় সেটি শ্মশান হিসেবে ব্যবহৃত হত। নিষ্কর জমি। আপনার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে ওইখানেই আপনি আপনার আশ্রম তৈরি করতে পারেন।



লোকনাথ ব্রহ্মচারি বললেন, বেশ, তোমরা আমাকে ওই জমিটিই দাও।

শুরু হল আশ্রম নির্মাণের প্রস্তুতি। নাগ জমিদাররা তাতে সর্বোতভাবে সাহায্য করলেও স্বয়ং লোকনাথবাবাও আশ্রম তৈরির ব্যাপারে হাত লাগালেন। একদিন শেষ হল আশ্রমের কাজ। লোকনাথজি নিজেই আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন ঠিক করে নাগ কর্তাকে বললেন, শোন, এখন যখন আমাকে তোদের সমাজেই থাকতে হবে তখন তোদের মতোই থাকাটা উচিত বলে আমি মনে করি। তোরা আমাকে একখণ্ড গেরুয়া কাপড় ও পইতে দান হিসেবে সেদিন দিস।

আশ্রম প্রতিষ্ঠার দিন নাগ কর্তা গেরুয়া কাপড় ও পইতে দান হিসেবে লোকনাথবাবার হাতে তুলে দিয়েছিলেন। সেই কোন শৈশবে, পইতে হওয়ার পরের দিন উপবীত ত্যাগ করে গুরু ভগবান গাঙ্গুলির হাত

ধরে তিনি ও তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু বেণীমাধব সংসার ত্যাগ করেছিলেন। এতকাল সংসার-মায়া থেকে তিনি নিজেকে সযত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। আবার বারদীতে তিনি সেই মায়ার অষ্টপাশ বন্ধনে স্বেচ্ছায় আবদ্ধ হলেন। অঙ্গে তুলে নিলেন গেরুয়া বস্ত্র, ধারণ করলেন উপবীত। তারপর আমাদের শোনালেন সেই অভয়বাণী 'রণে বনে জলে জঙ্গলে যখনই বিপদে পড়বি, আমায় স্মরণ করবি, আমি তোকে রক্ষা করব।'



লোকনাথবাবার সিন্দুকের তালা খুলে ফেললেন সুরথ

শান্তি হারিয়ে গেছে! স্বস্তি ফেরার! নিশ্চিন্তে আশ্রমে বসবার উপায় নেই। প্রায় সবাই এখন কৃপা প্রার্থী। ভক্তের পাশাপাশি বিপন্নের সংখ্যাও ক্রমশ বাড়তে শুরু করল। স্বয়ং ঈশ্বর লোকনাথবাবাও যথেষ্ট বিব্রত। নানারকম আবদার নিয়ে অসংখ্য মানুষ আশ্রমে আসতে শুরু করেছেন। কারও মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না, কারও স্বামীর জীবন যায় যায়, কেউ বা আসছেন ভয়ঙ্কর মামলার হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে। এইরকম অবস্থায় বারদীর আশ্রমে অদ্ভুত ভাবে এসে পৌঁছলেন অখিলচন্দ্র সেন।

গোবিন্দপুর গ্রামের স্বনামধন্য জমিদার তারকনাথ সেনের একমাত্র পুত্র অখিলচন্দ্র। পিতার মৃত্যুর পর তিনিই এখন জমিদারি দেখাশোনা করেন। প্রথম বিবাহ যে কোনও কারণে স্থায়ী হয়নি। তাই তিনি আবার বিয়ে করেছেন। বর্তমানে বিধবা মা ও দ্বিতীয় স্ত্রীকে নিয়ে তাঁর সুখের সংসার। সেবার এক ঝমঝমে বৈশাখের মধ্যাহ্নে নিত্যসঙ্গী তুলসীকে নিয়ে অখিলবাবু তাঁর পিসতুতো ভাইয়ের বিয়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে ভাইয়ের বাড়ির উদ্দেশে রওনা হলেন।

সেবার গরমটাও বেজায় পড়েছিল। পথে যেতে যেতে অখিলচন্দ্রের প্রবল জল পিপাসা পেল। সঙ্গে জল আনতেও ভুলে গেছেন। তিনি তুলসীকে বললেন, 'জল না পেলে তো এবার প্রাণ যাবে রে!'

উত্তরে তুলসী বললেন, 'সামনেই লোকনাথবাবার বারদীর আশ্রম। সেখানে গেলে অবশ্যই জল পাওয়া যাবে।'

অখিল বললেন, 'খালি হাতে সাধু দর্শন শাস্ত্রবিরুদ্ধ। এক কাজ কর, পাঁচশো তালমিছরি কিনে নিয়ে আয়। তারপর আমরা আশ্রমে যাব।'

তুলসী মিছরি কিনে আনার পর আবার যাত্রা শুরু হল। বারদীর আশ্রমে পৌঁছবার পর অখিল বললেন, 'আমি নামব না, আশ্রমে ঢুকতে হলে জুতো খুলতে হবে। আমি আর জুতো খুলতে পারব না। তুই গিয়ে একটু জল চেয়ে নিয়ে আয়।'

বাবুর কথা মতো তুলসী আশ্রমে প্রবেশ করে লোকনাথজিকে প্রণাম করলেন। তারপর সাধুদর্শনের প্রণামীস্বরূপ অত্যন্ত ভক্তিভরে তাঁর হাতে তালমিছরির ঠোঙাটি তুলে দিয়ে বললেন, 'আমার বাবুর বড্ড জল পিপাসা পেয়েছে, একটু জল পাওয়া যাবে কি?'

বাবা বললেন, 'জল অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে তুই তোর বাবুকে ভেতরে আসতে বল।'

তুলসী বললেন, 'বাবু, ভেতরে আসতে পারবেন না। উনি যে জুতো পরে আছেন।'

বাবা বললেন, 'আচ্ছা, তোর বাবুকে জুতো খুলতে হবে না। যা ডেকে নিয়ে আয় তাঁকে।' তারপর বললেন, 'ছাড়, তোকে ডাকতে হবে না। আমিই ডাকছি তোর বাবুকে।'

দুকদম এগিয়ে গিয়ে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী একটু গলা চড়িয়ে বললেন, 'অখিল, এই আশ্রমে যে আসে তাকে জুতো খুলতে হয়। কিন্তু তুই জুতো পরেই ভেতরে আয়। আমি তোকে সেই অনুমতি দিলাম।'

ঈশ্বরের পেতে রাখা অদৃশ্য ফাঁদে নিজের অজান্তেই জড়িয়ে পড়লেন জমিদার অখিলচন্দ্র সেন। তিনি জুতো পরেই আশ্রমে প্রবেশ করলেন।

তাঁকে দেখে মৃদু হেসে লোকনাথজি বললেন, 'বেড়ে সেজেছিস তো!'

উত্তরে অখিল বললেন, 'এই দেহটাই তো দেবমন্দির, একে সাজাব নাতো কাকে সাজাব!'

উত্তরে লোকনাথবাবা বললেন, 'তা বেশ, ভালোই করেছিস। নে এবার জল খা।'

অখিল বললেন, 'জল তো খাবই। তোমার হাতের জল খেলেই আমার জীবন ধন্য হবে।'

অখিলের জল খাওয়া শেষ হল। শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী অখিলের আপদমস্তক তিনবার নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হচ্ছিল যেন কত আপনজনকে তিনি দীর্ঘদিন বাদে কাছে পেয়েছেন।

অখিল বাবাকে প্রণাম করে বললেন, 'এবার তাহলে আমরা বেরিয়ে পড়ি।'

লোকনাথজি বললেন, 'সাবধানে যাস। আবার আসিস কিন্তু।'

অখিল বললেন, 'হ্যাঁ, আসব বাবা। যদি তুমি নিজ গুণে এই অধমকে কৃপা কর।'

অখিল ও তুলসী আবার বাবাকে প্রণাম করে বিদায় নিলেন। এরপর কী ঘটল! অখিলচন্দ্র সেনের আর কোনও কাজেই মন বসেনা। সারাক্ষণ কী যেন একটা ঘোরের মধ্যে থাকেন। পুত্রের এই অবস্থা দেখে তাঁর মা তাঁকে নিজের গুরুদেবের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে গিয়ে অখিল গুরুদেবকেও কিছু বলতে পারলেন না। বরঞ্চ সেদিনই বাড়ি ফিরবেন বলে মনস্থ করলেন।

কিন্তু সমস্যা হল নৌকায় ওঠার পর। হঠাৎ জ্ঞান হারালেন অখিল। অন্যদের শুশ্রুষায় কিছুক্ষণের মধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁর মনে পড়ল বারদী আশ্রমের কথা। পরদিন সকালেই অখিলচন্দ্র বারদী আশ্রমে গিয়ে পৌঁছলেন। এইভাবে কেটে গেল দুটো বছর। রোজ সকালে তিনি আশ্রমে এসে বাবার পাশে চুপটি করে বসে পড়েন। কোনও কথা কারও সঙ্গে বলেন না। তারপর সন্ধে হলে তিনি বাবাকে প্রণাম করে ফিরে যান নিজের বাড়িতে।

এক ভক্ত একদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বললেন, বাবা, অখিল, রোজ আসে, কিন্তু কোনওদিন দুপুরের প্রসাদ পায় না। আপনি কেন ওকে খেতে বলেন না?

লোকনাথজি বললেন, 'সেটা তুই অখিলের কাছ থেকেই জেনে নিস।'

পরদিন অখিল আশ্রমে আসা মাত্র সেই ভক্ত তাঁর কাছে গিয়ে বললেন,'দুপুরে আপনি এখানে প্রসাদ খাননা কেন?'

অখিল বললেন, 'এখানে যাঁরা দুপুরে প্রসাদ গ্রহণ করেন তাঁরা আশ্রমে কিছু না কিছু দেন, আমি কিছু দিই না, তাই প্রসাদও খাই না।'

অখিল সেদিন চলে যাওয়ার পর লোকনাথ ব্রহ্মচারী ওই ভক্তকে ডেকে বললেন, 'ওরে শোন! অখিল কিন্তু সাধারণ ভক্ত নয়। সে এখানে কেন আসে জানিস? আমি দেড়শো বছর কঠোর সাধনা করে যে সম্পদ অর্জন করেছি, সেই সিন্দুকের তালা ভেঙে সব ও নিয়ে যেতে চায়।'

সেই অসাধারণ ভক্ত অখিলচন্দ্র সেনকে পরবর্তীকালে শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দেন। তাঁর সন্ন্যাস নাম ছিল 'সুরথ ব্রহ্মচারী'। একদিন লোকনাথ ব্রহ্মচারী তাঁর অন্তরঙ্গ কয়েকজন ভক্তকে কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'জানিস, সুরথ আমার সঞ্চিত ধনরত্নের সিন্দুকের তালা খুলে ফেলেছে।



অভয়চরণকে গাঁজা সাজতে বললেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী

অভয়চরণ চক্রবর্তী, অধুনা ওপার বাংলার ময়মনসিংহ জেলার বাসিন্দা। সেখানকার এক রেজিস্ট্রি অফিসে তিনি কেরানিগিরি করতেন। স্ত্রী, পুত্র ও এক বড় দাদাকে নিয়ে তাঁর ছোট্ট সংসার। ছোট থেকেই এলাকায় ধার্মিক হিসেবে তাঁর বিশেষ পরিচিতি ছিল। সাধুসঙ্গ ও বিভিন্ন তীর্থস্থানে ভ্রমণ করতে তিনি বড়ই ভালোবাসতেন। তবে কেরানির সামান্য আয়ে সংসার সামলে মনের সাধ পূর্ণ করাটা ক্রমশ অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছিল। তবু মাঝেমধ্যে তিনি তল্পিতল্পা নিয়ে বেড়িয়ে পড়তেন ঈশ্বরের খোঁজে।

একদিন এই মানুষটার কাছে সংসারটা বিষবৎ হয়ে উঠল। তিনি বাড়ির কাউকে কিছু না বলে হঠাৎই একদিন সংসার ত্যাগ করলেন। তারপর কেটে গেল দীর্ঘ সতেরোটা বছর। বহু তীর্থস্থান দর্শন ও পাহাড়-পর্বত পরিভ্রমণ শেষে অভয়চরণ চক্রবর্তী সন্ন্যাসীর বেশে গৃহে ফিরে এলেন। তখন তিনি অভয় ব্রহ্মচারী। বাড়িতেই তিনি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করলেন।

আশ্রম স্থাপন তো হল, কিন্তু অর্থ আসবে কোথা থেকে! দিন দিন অভয় ব্রহ্মচারীর আর্থিক অনটন ক্রমশ বেড়েই চলল। সেবার শিব-চতুর্দশীর দিন কয়েক আগে আশ্রমে এলেন ময়মনসিংহের জজ কোর্টের এক উকিল। তিনি ব্রহ্মচারীর পূর্ব পরিচিত। সেদিন কথা বলতে বলতে সেই উকিল ভদ্রলোক ব্রহ্মচারীর কাছে জানতে চাইলেন, আপনাকে আজ কেমন যেন মনমরা লাগছে?

উত্তরে অভয় ব্রহ্মচারী দুঃখ করে তাঁকে বলেছিলেন, দেখুন, প্রতিবছর শিবরাত্রি উপলক্ষে আমি চন্দ্রনাথ তীর্থধামে যাই। কিন্তু এবার সময় ও অর্থাভাবের কারণে আর সেখানে যেতে পারব না। সেইকারণে মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

সব কথা শুনে উকিল মহাশয় বলেছিলেন, প্রতিবছরই তো শিবরাত্রিতে চন্দ্রনাথে গিয়ে পাষাণ শিব পুজো করেন। এবার একটা কাজ করুন। নারায়ণগঞ্জের বারদীতে গিয়ে সচল শিব দর্শন করে আসুন। ওই আশ্রমে এক মহাশক্তিধর মহাপুরুষ বাস করেন, তাঁকে দর্শন ও তাঁর সঙ্গে কথা বললে আপনার মনের সব ক্ষোভ দূর হয়ে যাবে। একথা আমি জোর গলা বলতে পারি।

কথা শেষ করে উকিল মহাশয় অত্যন্ত ভক্তিভরে অভয় ব্রহ্মচারীর হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলেছিলেন, এই টাকাটা দিলাম বলে আপনি কিছু মনে করবেন না। আপনার মনের অবস্থা এখন মোটেই ভালো নয়। বারদিতে গেলেই আপনার সমস্ত দুঃখ দূর হয়ে যাবে। এই সামান্য ক'টা টাকা আপনি পথে খরচ করবেন।

উকিলবাবুর কথামতো ব্রহ্মচারী অভয়চরণ শিব-চতুর্দশীর আগের দিন ঢাকায় এসে পৌঁছলেন। পরেরদিন নারায়ণগঞ্জ পৌঁছে হাঁটাপথে বারদীর উদ্দেশে রওনা হলেন। অভয় ব্রহ্মচারী আবার গাঁজা সেবন করতে ভালোবাসতেন। সেদিন হাঁটতে হাঁটতে তাঁর গাঁজার নেশাটা খুব প্রকট হয়ে উঠল। শুরু হল নেশার সঙ্গে

মনের যুদ্ধ। অবশেষে পরাজিত হল নেশা। অভয়চরণ নিজের মনেই বললেন, আজ একে শিব-চতুর্দশী তার ওপর বারদীতে মহাপুরুষ দর্শন করতে যাচ্ছি তাই কোনওমতেই গাঁজা খাওয়া চলবে না।

হাঁটতে হাঁটতে একসময় ব্রহ্মচারী আশ্রমের কাছে এসে পৌঁছলেন। আর একটু গেলেই আশ্রম। সেইসময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী কয়েকজন ভক্ত পরিবৃত হয়ে তাঁর আসনে বসে ছিলেন। ভক্তরা তাঁকে এমনভাবে ঘিরে বসেছিলেন যে কেউই চট করে তাঁর কছে আসতে পারবেন না। লোকনাথবাবা হঠাৎই ভক্তদের দিকে তাকিয়ে হাত নেড়ে কিছু ইশারা করলেন। ভক্তরা সেই ইশারার কোনও অর্থ খুঁজে পেলেন না। তাঁরা বাবার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তখন বাবা আবার হাত নেড়ে ইশারা করলেন।

উপস্থিত ভক্তরা বুঝতে পারলেন, হয়তো কোনও সাধু বা অতিথি আশ্রমে আসছেন তাই অন্তর্যামী বাবা তাদের সরে বসতে বলছেন, যাতে সেই মানুষটির বাবার সামনে পৌঁছতে কোনও অসুবিধা না হয়। বাবার নির্দেশমতো সবাই বেশ খানিকটা সরে বসলেন।

তার ঠিক কিছুক্ষণ বাদেই অত্যন্ত দ্রুতবেগে আশ্রমে প্রবেশ করলেন অভয় ব্রহ্মচারী। তারপর তিনি কোনওদিকে না তাকিয়ে সোজা লোকনাথজির কাছে এসে তাঁকে প্রণাম করে ধপ করে বসে পড়লেন।

ক্লান্ত, পথশ্রান্ত ব্রহ্মচারীর দিকে তাকিয়ে লোকনাথ ব্রহ্মচারী মৃদু হেসে জানতে চাইলেন হ্যাঁরে অভয়চরণ, পথে খুব কষ্ট পেয়েছিস তো?

অভয়চরণ ভাবলেন বাবা তাঁর পথ-কষ্টের কথা জানতে চাইছেন। তাই তিনি বললেন, না, তেমন কোনও কষ্ট হয়নি।

কিন্তু একটু বাদেই অভয় ব্রহ্মচারীর সেই ভুল ভেঙে গেল। লোকনাথজি মৃদু হেসে তাঁকে বললেন, একটু গাঁজা সেজে নিয়ে আয় না।

বিব্রত অভয়চরণ। সেই মুহূর্তে কী করবেন তা ভেবে পাচ্ছেন না। নানা চিন্তা মনে এসে ভিড় করছে। ইস! এইরকম এক মহামানব আমার নেশার কথা জেনে ফেলেছেন। ঠিক সেইসময় লোকনাথজি বললেন, ওরে, চুপ করে বসে না থেকে গাঁজাটা সেজে নিয়ে আয় না!

অভয় ব্রহ্মচারী গাঁজা সেজে নিয়ে এসে কলকেটা বাবার সামনে রাখলেন। আর ঠিক সেইসময় ঘটল এক অলৌকিক ঘটনা। হঠাৎই এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল আশ্রমের ওপর দিয়ে। কলকেতে তখনও অগ্নি সংযোগ করা হয়নি। কিন্তু সেই কলকে থেকে ধক করে লাফিয়ে উঠল আগুন। তারপরই সেখান থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী বেরিয়ে এসে প্রবেশ করল লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাসাগহ্বরে। তিনি এরপর অভয়চরণকে বললেন, নে এবার তুই সেবন কর।

অভয়চরণ বললেন, আপনি তো প্রসাদ করে দিলেন না।

লোকনাথজি বললেন, সে কীরে! এই তো একটু আগেই প্রসাদ করে দিলাম।

অভয় ব্রহ্মচারী এতক্ষণে বাবার অসীম লীলার কথা বুঝতে পারলেন। তিনি কলকেটাকে মাথায় ছুঁইয়ে ওম নম শিবায় নম ও জয় লোকনাথ বাবা বলে লম্বা একটা টান দিলেন। তারপর! পরমানন্দে, চোখ বুজিয়ে সেই ধোঁয়া উড়িয়ে দিলেন মহাশূন্যে।

সেই দৃশ্য দেখে লোকনাথবাবা তখন অলৌকিক এক হাসি হাসছেন। আর অভয়চরণ! বাবার আদেশে সেই রাতটা আশ্রমেই কাটাবেন বলে ঠিক করলেন।



অভয়কে রজনীর হাতে সমর্পণ করলেন লোকনাথজি

আস্তে আস্তে অন্ধকার কাটছে, আর একটু বাদেই সূচনা হবে নতুন এক দিনের। ঘরের দরজা খুলে আশ্রম প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়ালেন অভয় ব্রহ্মচারী। লোকনাথবাবার ঘরের দরজা তখনও বন্ধ। পাখিদের কল-কাকলিতে বারদির আকাশ-বাতাস মুখরিত। আজ যেন একটু চিন্তিত লাগছে অভয়চরণকে।

একটু বেলা বাড়ার পর লোকনাথবাবার সঙ্গে দেখা হল অভয়ের। কোনও কথা নয়, ব্রহ্মচারী সোজা লুটিয়ে পড়লেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চরণে। তারপর 'ভগবান'-এর পা দুখানি চেপে ধরে অভয় বললেন, বাবা আপনি আমাকে কৃপা করুন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী বললেন, 'তুই নিজেই তো একজন ব্রহ্মচারী। তাহলে আমার কাছে কেন কৃপা ভিক্ষা করছিস! আর আমার কাছেই বা এসেছিস কেন? আমিও মানুষ, তুইও মানুষ। আমিও খাই, তুইও খাস। তাহলে কেন তুই আমার কাছে এলি।'

অভয় ব্রহ্মচারী মনে মনে বললেন, বুঝেছি, তুমি আমার কাছে ধরা দেবেনা বলেই এইসব হেঁয়ালি করছ। কিন্তু তাতো হবার নয়। কারণ আমি মহাতীর্থ চন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করে সচল শিবের কৃপা পাবার জন্য উপবাস করে এখানে পাগলের মতো ছুটে এসেছি। আমি তো তোমাকে ছাড়বনা। যদি আমার অন্তরে একনিষ্ঠ ভক্তি থাকে তাহলে দেখব তুমি আমাকে কীভাবে উপেক্ষা করে থাকতে পার!

লোকনাথবাবার পা চেপে ধরে তখনও মাটিতে পড়ে আছেন অভয় ব্রহ্মচারী, আর বিড়বিড় করে বলছেন, বাবা, আমাকে কৃপা করুন, কৃপা করুন।

কিন্তু লোকনাথ ব্রহ্মচারী! তিনি উদাসীন মুখে তাকিয়ে আছেন অন্যদিকে। পা ছাড়াবার চেষ্টাটি পর্যন্ত করছেন না। বাবার এই উপেক্ষায় একটা সময় ভয়ংকর রকমের রেগে গেলেন অভয় ব্রহ্মচারী। তিনি মাটিতে তিনবার মাথা ঠুকে ভূমি শয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়িয়ে লোকনাথ বাবাকে বললেন, 'আমি চললাম তোমার আশ্রম থেকে।'

এই কথারও কোনও উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন মনে করলেন না লোকনাথজি। তিনি তখনও ওইখানেই চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন। হয়তো অভয় ব্রহ্মচারীর এহেন কাণ্ড দেখে মনে মনে হাসছেন।

বাবার এই উপেক্ষায় অভয় ভীষণই কষ্ট পাচ্ছিলেন। তিনি আর কোনও কথা না বাড়িয়ে ফেরার পথ ধরলেন। একবারও আর পেছন ফিরে তাকালেন না।

সেইসময় আশ্রমের এক ভক্ত দৌঁড়ে এসে লোকনাথজিকে বললেন, 'বাবা! ওই ব্রহ্মচারী কাল থেকে উপবাস করে আছেন। এখনও একফোঁটা জল পান করেননি। আপনি ওঁকে প্রসাদ খেয়ে যেতে বলুন।'

লোকনাথজি তখন সেই ভক্তকে বললেন, 'অভয়কে বসতে বল। ওর জন্য এখনিই প্রসাদ আসছে।'

লোকনাথজির এই কথায় আরও রেগে গেলেন অভয় ব্রহ্মচারী। তিনি বাবার দিকে না তাকিয়েই বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ সন্তান। দু-একদিন না খেতে পেলে মরব না। আর যদি খুব বেশি খিদে পায় তাহলে তিন-চার

বাড়ি ঘুরে কয়েক মুঠো চাল সংগ্রহ করে নিজের হাতে তা ফুটিয়ে খেয়ে নেব।' কথা শেষ করে তিনি দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। আর ঠিক সেইসময় তাঁর পথরোধ করে দাঁড়ালেন দুজন মহিলা। তাঁদের দুজনের হাতে থালা ভর্তি নানা রকমের আহার্য দ্রব্য। এই দুজন মহিলা শিবরাত্রি উপলক্ষে গতকাল রাতে বাবার জন্য নানাবিধ রান্না করেছিলেন। সকাল হতেই তাঁরা সেইসব খাদ্যদ্রব্য নিয়ে চলে এসেছেন আশ্রমে। তাঁরা যখন আশ্রম ঢুকছেন সেইসময় আশ্রম পরিত্যাগ করছিলেন অভয় ব্রহ্মচারী। দুই রমণীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন তিনি।

মা ও মেয়েকে দেখতে পেয়েই লোকনাথজি খুব মিষ্টি স্বরে অভয়কে বললেন, ওরে তোর খাবার এসে গেছে। আর রাগ করে থাকিস না। আয়! খেতে বোস।

বাবার এই আদেশ আর উপেক্ষা করতে পারলেন না অভয় ব্রহ্মচারী। তিনি বাধ্য ছেলের মতো এসে খেতে বসলেন। অভয়চরণের তখন সত্যিই খুব খিদে পেয়েছিল। তিনি গোগ্রাসে খেতে শুরু করলেন। অর্ধেক খাওয়া তখন শেষ হয়ে গেছে, এমন সময় লোকনাথজি বললেন, 'জানিস তো, এটা কায়েতের মেয়ের হাতের রান্না।'

উত্তরে অভয় ব্রহ্মচারী বললেন, 'আমি তো প্রসাদ খাচ্ছি। তা চণ্ডালের মেয়ে রাঁধলেই বা দোষ কি?'

প্রসাদ খেয়ে সেদিন আশ্রমেই থেকে গেলেন অভয় ব্রহ্মচারী।

পরদিন সকালে নিজের আশ্রমে ফিরে যাওয়ার আগে অভয় লোকনাথজিকে প্রণাম করতে এলেন। তিনি প্রণাম করে মাথা তোলা মাত্রই লোকনাথবাবা বললেন, 'যা পাওয়ার জন্য সতেরো বছর ধরে এত জায়গা পরিভ্রমণ করলি তা কি তুই লাভ করেছিস?'

উত্তরে অভয় বললেন, 'না পাইনি।'

লোকনাথ ব্রহ্মচারী তখন কী করলেন! তিনি অভয়ের ডান হাতের কবজির একটু ওপর অংশে চাপ দিয়ে বললেন, 'যা পাওয়ার জন্য তুই এতকাল হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিস তা আজ তোর হাতে আমি বেঁধে দিলাম। আর তোকে অমন করে ঘুরে বেড়াতে হবে না। শুধু পরিভ্রমণে কী সব কিছু পাওয়া যায় রে! মনে রাখবি কর্মই হল ব্রহ্ম।'

লোকনাথজি কথা শেষ করে নিজের অন্যতম শিষ্য রজনী ব্রহ্মচারীকে ডেকে বললেন, 'রজনী, তুই অভয়কে তোর সঙ্গে নিয়ে যা। ওকে বুঝিয়ে দে, তুই এখন কী কর্ম করছিস।' তারপর তিনি অভয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'শোন, হতাশ হোসনা। জানবি, রজনীও যা আমিও তাই। ও আমার সিলমোহরের নকল। ওর মধ্যেই আমার সমস্ত সত্তা বিরাজিত। ও আমার সেই সত্তায় ডুব দিয়ে তোকে যা উপদেশ দেবে তা আমারই উপদেশ বলে মনে করবি।' লোকনাথজির আদেশ মতো রজনী ব্রহ্মচারী অভয়কে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে রওনা হলেন।



লোকনাথজির কৃপায় মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এলেন নিশিকান্ত বসু

ডাক্তার নিশিকান্ত বসু, বি.এস. এম.ডি। পিতা রজনীকান্ত বসু। মাতা রাজকুমারী বসু। অধুনা বাংলাদেশের বারদীর বড় জমিদার স্বর্গীয় কালীকিশোর নাগ মহাশয়ের কনিষ্ঠা কন্যা ছিলেন রাজকুমারী দেবী। নিশিকান্তবাবুর বাবা রজনীকান্ত তেজপুরের ডেপুটি কমিশনারের অফিসে চাকরি করতেন। বেতন পেতেন খুবই সামান্য। নিশিকান্ত ছিলেন এই বসু দম্পতির তৃতীয় সন্তান। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর প্রচুর সুনাম ছিল। পরবর্তীকালে ভক্ত ও সাধক হিসেবেও তিনি যথেষ্ট সমাদৃত হন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার সামলেছেন।

ডাঃ নিশিকান্ত বসু নিজেকে লোকনাথ ব্রহ্মচারীর চরণে সমর্পণ করেছিলেন। সাধকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত প্রগাঢ় ও মধুর। কারণ তাঁর মামার বাড়ি ছিল আশ্রমের ঠিক পাশটিতে। ভেঙ্গু কর্মকারের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের সদস্যরা যখন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে বাড়ি থেকে বিতাড়িত করেন সেইসময় এই নাগ জমিদাররাই সাধকের পথরোধ করে বলেছিলেন, 'আপনি বারদী ছেড়ে কোথাও যেতে পারবেন না। আপনি এখানেই থাকবেন। আপনার কি চাই সেটা শুধু আমাদের বলুন।' উত্তরে লোকনাথজি বলেছিলেন, একখণ্ড নিষ্কর জমি চাই, সেখানে আমি আশ্রম তৈরি করব। নাগ জমিদাররা সেদিনই সাধককে আশ্রম তৈরির জন্য জমি দিয়েছিলেন। লোকনাথ ব্রহ্মচারী সেখানেই তাঁর আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারীতেই নিজেকে নিমজ্জিত করেছিলেন ডাক্তার নিশিকান্ত বসু। বহুবার বহু বিপদের হাত থেকে তিনি রক্ষা পেয়েছেন এই সাধকের কৃপায়। সেইসময় তিনি বারদী-কন্যা হেমলতা দেবীকে বিয়ে করেছেন এবং তার কিছুদিন বাদেই পিতার নির্দেশে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি ডিব্রুগড় কলেজে ভর্তি হলেন। ডিব্রুগড়ে থাকাকালীন তিনি নিয়মিত নদীতে স্নান করতে যেতেন। প্রত্যেকদিনের মতো সেদিনও তিনি তাঁর চার বন্ধুকে নিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদীতে স্নান করতে গেলেন। স্নান করতে নামার আগে তাঁরা ঘাটে বসে গল্পগুজব করছিলেন। হঠাৎই এক বন্ধু বললেন, নদীর মাঝে ওই যে চড়াটা পড়েছে আজ ওখানে আমরা সাঁতার কেটে যাব। সবাই কোমরে গামছা বেঁধে জলে ঝাঁপ দিলেন।



শ্রীশ্রীলোকনাথ মন্দির তেঘরিয়া থেকে প্রকাশিত 'লোকনাথ প্রভাবে আমার জীবন' গ্রন্থে ডাঃ নিশিকান্ত বসু লিখছেন, 'নদীর মাঝখানে এক চড়ায় সাঁতার কাটিয়া যাইব বলিয়া আমরা চারিজন রওনা হইলাম। সে সময় ছিল শীতকাল। ব্রহ্মপুত্রের জল ভয়ানক ঠান্ডা ও প্রখর স্রোত থাকার দরুন অর্ধেক রাস্তা সাঁতার কাটিয়া যাওয়ার পরে আমার শরীর অবশ হইয়া গেল, আর যাইতে পারিলাম না। ক্রমে ডুবিতে আরম্ভ করিলাম। তখন হাত উঁচু করিয়া নদীর পাড়ের লোকেদের সাহায্যের জন্য ডাকিলাম। কেহ কেহ মনে করিল মিথ্যা ভান করিতেছি।'

প্রতিদিন যতীশচন্দ্র চক্রবর্তী নামে এক স্কুল শিক্ষকও তাঁদের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে আসতেন। সেদিন কোনও কারণে তাঁদের সঙ্গে তিনি আসতে পারেননি। তিনি স্নান করতে এসে দেখেন এক যুবক ক্রমশ জলে তলিয়ে যাচ্ছেন। ডুবন্ত মানুষটি যে তাঁরই বন্ধু নিশিকান্ত বসু তা তিনি তখনও বুঝতে পারেননি। যতীশবাবু বিপন্ন মানুষটিকে বাঁচাবার জন্য এক মাঝিকে রাজি করিয়ে নৌকা নিয়ে রওনা হলেন।

সেই মুহূর্তে নিশিকান্ত বাবুর মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল তা তিনি তাঁর ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করে রেখে গেছেন। তিনি লিখছেন, 'আমার হাত-পা এবং সমস্ত শরীর অবশ হইয়া যাওয়ায় আমি ডুবিয়া গেলাম। এক মুহূর্তে সকল আত্মীয়-স্বজন, নূতন বিবাহিত স্ত্রীর কথা মনে হইল। মনে হইল কেহ জানিল না আমার এইভাবে জলে ডুবিয়া মৃত্যু হইল। শ্বাসরোধ হইয়া গেল, ভয়ানক কষ্ট হইতে লাগিল। একবার শ্বাস টানিতে বাধ্য হইলাম, হাওয়ার পরিবর্তে শ্বাসনালীতে জল ঢুকিল। ডুবিতে ডুবিতে একেবারে জলের তলায় মাটি স্পর্শ করিলাম। মাটিতে পা ঠেকিল। তৎক্ষণাৎ ভগবান লোকনাথকে স্মরণ হইল। মনে মনে বলিলাম, 'এই আমার শেষ ও ভয়ানক কষ্টদায়ক মৃত্যু। তোমার অসীম শক্তি, তুমি ইচ্ছা করিলে এখনই এই অবস্থা হইতে আমাকে রক্ষা করিতে পার।' তখনই যেন নতুন বল পাইলাম। জলের ওপর ভাসিয়া উঠিলাম।'

আর ঠিক সেইসময় তাঁর বন্ধু স্বর্গীয় পুলিশ ইন্সপেক্টর রাজমোহন দাসের বড় পুত্র সুরেশচন্দ্র সাঁতরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। তিনি বন্ধুর হাতটা চেপে ধরে তাঁকে ভাসিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে নৌকো নিয়ে যতীশবাবু সেখানে এসে পৌঁচেছেন। কিন্তু তাঁরা সকলে মিলে চেষ্টা করেও নিশিকান্তবাবুকে নৌকোয় তুলতে পারলেন না। তাই যতীশবাবু বন্ধুর হাত ধরে নৌকায় বসে রইলেন। স্রোতের টানে নৌকো আপন খেয়ালে ভেসে চলল। এইভাবে ভাসতে ভাসতে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর মাঝি একটা ঘাটে নৌকো ভেড়াতে সক্ষম হলেন। সেই ঘাটে তখন মেডিক্যাল স্কুলের ছেলেরা স্নান করছিলেন। তাঁরাই ধরাধরি করে নিশিকান্তবাবুকে রাজমোহনবাবু বাড়ি পৌঁছে দিলেন।

সদ্য মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসে নিশিকান্তবাবু প্রাথমিক ভাবে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখছেন, 'শরীর একেবারে ঠান্ডা হইয়া গিয়াছিল। শরীরটি আগুনে গরম করিতে লাগিল। শ্রীযুক্ত শশীকান্ত মিত্র নামে আমার এক সহপাঠী রাস্তার অপর পারের হাসপাতাল হইতে খানিকটা ব্র্যাণ্ডি আনিয়া খাওয়াইয়া দিল। বাঁচিয়া গেলাম। ভগবানের কি দয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিলাম।'



আমেরিকায় এক ইংরেজ মহিলাকে দর্শন দিলেন লোকনাথজি

ডাঃনিশিকান্ত বসু সেইসময় আমেরিকায়। চাকরি করেন ডাঃ লিন্ডলার সেনিটোরিয়ামে। চিকিৎসক হিসেবে তখন তাঁর বেশ নামডাক।

একদিন ওই সেনিটোরিয়ামে চিকিৎসার জন্য ভর্তি হলেন বছর তিরিশের এক ইংরেজ মহিলা। পেটে বিশাল এক টিউমার নিয়ে। সেই টিউমারের চিকিৎসার জন্য তিনি এখানে এসেছেন। কিন্তু সেনিটোরিয়ামে তখন কোনও বেড খালি ছিলনা বলে সেই মহিলাকে রাস্তার ওপারে একটি বাড়িতে রাখার ব্যবস্থা করলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

সেই রোগিনীকে চিকিৎসা করার ভার এরপর ডাঃ বসুর ওপর সঁপে দিলেন ডাঃ লিন্ডলার। সেই মহিলাকে নানাবিধ পরীক্ষা করে নিশিকান্ত বাবু বুঝতে পেরেছিলেন এই মহিলার চিকিৎসা এখানে করা সম্ভব নয়। কারণ তাঁর টিউমারের আকার ও প্রকৃতি তখন বেশ জটিল আকার ধারণ করেছে। টিউমারটির চাপে বৃহদন্ত্রের একটি অংশে ছেঁদা হয়ে গিয়েছে। মাঝে মাঝে সেখান দিয়ে মল বেরিয়ে এসে পেটে নানাবিধ সমস্যার সৃষ্টি করছে। অস্ত্রোপচার ছাড়া এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাবার কোনও উপায় নেই।

কিছু করা সম্ভব নয় জানা সত্ত্বেও ডাঃ বসু রোগিনীর চিকিৎসা শুরু করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই চিকিৎসক ও রোগিনীর মধ্যে একটা মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠল। এদিকে ডাঃ বসু রোগিনীর সঙ্গে সেনিটোরিয়ামের এই বিশ্বাসঘাতকতা কিছুতেই মন থেকে মেনে নিতে পারছিলেন না। কিন্তু তিনিও হাসপাতালের বিরুদ্ধে মুখ খোলার সাহস পাচ্ছিলেন না। কারণ তিনি ওখান থেকে তখন বেশ মোটা বেতন পান। তাই চাকরি যাওয়ার ভয়ে তিনিও চুপ করে ছিলেন।

প্রতিদিন সকালে হাসপাতালে আসার আগে ডাঃ নিশিকান্ত বসু সেই মহিলাকে দেখতে যেতেন। একদিন সকালে তিনি ওই মহিলাকে দেখতে গেছেন। কিন্তু ডাঃ বসু কিছু বলার আগেই ভদ্রমহিলা বললেন। 'দেখ! ডাঃ বসু! আমি তোমাকে সম্পূর্ন বিশ্বাস করি। আমি তোমাদের এখানে অনেকদিন রয়েছি। তুমি আমার চিকিৎসা করছ। অথচ আমার রোগ এখনও সারলনা। আমি কোনও উপকার পেলাম না। কিন্তু তুমি আমাকে যা বলবে আমি তাই করব! তুমি বল, এখন আমার কি করা উচিত?

ডা বসু যখন তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে যাচ্ছেন ঠিক সেইসময় ওই মহিলা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন 'Stop don't talk, I see somebody behind you and above your head. Do you know who is he!...'।

ডাঃ নিশিকান্ত বসু লিখছেন, তিনি বললেন, ডাঃ বোস, কথা বলিও না। চুপ কর। আমি একজনকে তোমার মাথার উপরে ও পিছনের দিকে দেখিতেছি। তাঁহার চুলগুলি সব একসঙ্গে করিয়া মাথার উপরে রাখা হইয়াছে। তাঁহার মুখ একদিকে, চোখ একটু অন্যদিকে। তাঁহার মোছ ও দাড়ি আছে। একখানা কাপড়

তাঁহার ডান হাতের নীচ দিয়া শরীর ঢাকিয়া বাম স্কন্ধের উপর দিয়া গিয়াছে। আমি তাঁহার কোমর পর্যন্ত দেখিতেছি। তুমি কি জান ইনি কে? ইনি নিশ্চয় তোমার 'স্পিরিচুয়্যাল গাইড?'

আমি আমার পশ্চাৎ দিকে না তাকাইয়া চুপ করিয়া সেই মেমসাহেবের মুখের দিকে চাহিয়া রইলাম। বুঝিলাম শ্রীশ্রীলোকনাথ বাবা আসিয়াছেন। তাঁহার অপার করুণা। বাবা বুঝাইয়া দিলেন যে তিনি আমার মাথার উপরে ও পশ্চাতে থাকিয়া সর্বদা আমাকে রক্ষা করিতেছেন। ওইরকম ভাবে আর্বিভূত না হইয়া যদি আমার চক্ষের সম্মুখে দেখা দিতেন তাহা হইলে মনে হইতে পারিত যে আমার চক্ষের ভ্রম। অন্য লোকেও তাহা মনে করিতে পারিত। কিন্তু একজন ইংরেজ মহিলা যিনি কখনও কোন হিন্দুকে দেখেন নাই এবং কখনও ওইরকম পরিচ্ছেদ দেখেন নাই, তিনি ওইরূপ দেখিলেন। তাঁহার ফটো আমি আমেরিকায় লইয়া যাই নাই। ফটো নিকটে থাকিলে মনে হইতে পারিত যে কোন প্রকারে তিনি ওই ফটো দেখিয়াছেন। আমিও ওই সময়ে তাঁহাকে ভাবিতেছিলাম না।

এ কেবল তাঁহারই দয়া। আমার ভক্তি বিশ্বাস বাড়াইবার জন্য ও আমাকে নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্য তাঁহার এ কৌশল। জীবন ভরিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম। আমি ধন্য হইলাম। মনুষ্য জীবন সার্থক হইল। সর্বশক্তিমানের আশ্রয় পাইলাম।'

ডাঃ নিশিকান্ত বসু সেই সকালে ওই ঘরে বসে তারপর কী করলেন! তিনি সেই ইংরেজ মহিলাকে বললেন, আজ থেকে তুমি সবসময় 'লোকনাথ' নামটি মনে করে রেখ। এরপর একটি কাগজে তিনি শ্রীশ্রীলোকনাথ নামটি লিখে দিয়ে বলেছিলেন, 'এখানে তোমার রোগের চিকিৎসা করা সম্ভবপর নয়। তুমি অবিলম্বে অন্য হাসপাতালে ভর্তি হয়ে টিউমারটা অপারেশান করিয়ে নাও। তুমি দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে।'

ডাঃ বসু একজন নার্সকে সঙ্গে দিয়ে সেই মহিলাকে সেদিনই অন্য হাসপাতালে পাঠিয়ে দিলেন। দিনকয়েক বাদে সেখানে তাঁর অপারেশানও হল। পরবর্তী কালে ডাঃ বসু একজায়গায় লিখছেন, 'তিনি চলিয়া গেলে আমাদের ব্যবসায়ের ক্ষতি হয়। তিনি থাকিলে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত ৭৫ টাকা আসে। এই আয় কমানো সেনিটোরিয়ামের কর্মচারীর বিশেষ প্রধান কর্মকর্তার ব্যবসায়-বুদ্ধি বিরোধী। সর্বদা সত্য আচরণ করিতাম বলিয়া সেই মহিলা আমাকে বিশ্বাস করিতেন। পাছে আমার ব্যবসায় বুদ্ধি জাগ্রত হইয়া তাঁহাকে সেনিটোরিয়ামে রাখিবার চেষ্টা করি সেইজন্যে যে মুহূর্তে আমি তাঁহার প্রশ্নের উত্তর দিতে উদ্যত সে সময় 'বাবা' দেখা দিলেন। আমাকে সত্য পথ দেখাইয়া দিলেন। কোন প্রকার কপটতা বা মিথ্যা আচরণ হইতে আমাকে রক্ষা করিলেন।'

পরবর্তী কালে ডাঃ নিশিকান্ত বসু বহুবার বাবা লোকনাথের দর্শন পেয়েছিলেন। তাই তো আজও ডাঃ বসুর নাম ভক্তজনেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।



বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ফিরিয়ে দিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে

রাজরোগ যক্ষা। মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার এটাই ছিল সেই সময়কার সবথেকে সহজ পন্থা। কিন্তু মৃত্যু যাঁর পদানত দাস, আজ্ঞাবহ ভৃত্য, তাঁকে মরণ স্পর্শ করবে কীভাবে! একমাত্র উপায় স্বেচ্ছামৃত্যু। সেই পথেই হাঁটলেন শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী। মাঝে মাঝেই ভক্তদের কাছে তিনি তাঁর জীর্ণ শরীরের কথা বলতেন। তখন তাঁর কাছে শরীরটা হয়ে উঠেছিল বোঝার মতো। জীর্ণ বস্ত্রের মতো তিনিও তাঁর দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহৃত শরীরটাকে পরিত্যাগের চিন্তভাবনা শুরু করলেন। প্রথমদিকে কেউই তাঁর এই ইচ্ছার কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু তিনিই একদিন আশ্রমের গোয়ালিনী মাকে বললেন, মা, আমি চলে যাওয়ার পর তোর কাজের দায়িত্ব আরও বেড়ে যাবে। 'আমি চলে যাওয়ার পর' কথাটি শুনেই জ্ঞান হারালেন গোয়ালিনী মা। লোকনাথজি তখন প্রবল অসুস্থ। প্রত্যেকবার কাশির সঙ্গে রক্তপাত হচ্ছে। ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছেন ভক্তের ভগবান লোকনাথ বাবা। এইরকম অবস্থায় তিনি তাঁর বিদায়ের তারিখটিও জানিয়ে দিলেন ভক্তদের। কিন্তু যাব বললেই তো যাওয়া যায়না! আশ্রমের ভার তো যোগ্য মানুষের হাতে অর্পণ করে যেতে হবে।

অসুস্থ লোকনাথবাবার প্রথম যে নামটি মনে পড়েছিল তিনি হলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। তিনি গোঁসাইজিকে জীবনকৃষ্ণ নামে ডাকতেন। চন্দ্রনাথে দাবানলের গ্রাসে প্রাণ যেতে বসেছিল বিজয়কৃষ্ণের। সেইসময় চন্দ্রনাথ পাহাড়ে অবস্থান করছিলেন লোকনাথজি। তাঁরই কৃপায় সেবার প্রাণ ফিরে পান গোঁসাইজি। বায়ু বেগে পাহাড় থেকে নেমে এসে তিনি গোঁসাইজিকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে নিরাপদ স্থানে নামিয়ে রেখে আসেন। পরবর্তীকালে দ্বারভাঙ্গায় যখন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রবল অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, সেইসময়ও বারদী থেকে শূন্যমার্গে দ্বারভাঙ্গায় উড়ে গিয়ে তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছিলেন লোকনাথ ব্রহ্মচারী।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একবার বারদীতে গিয়েছিলেন। সেইসময় লোকনাথজির সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছিল। শ্রীশ্রীব্রহ্মচারীবাবা তাঁকে নিজের পরিচয় দিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমার পিতামহের কাকা।' এরপর তিনি পূর্বপুরুষের স্মৃতি হিসেবে একজোড়া খড়ম ও একখানি কম্বল গোঁসাইজিকে দিয়েছিলেন।

লোকনাথ ব্রহ্মচারী যখন বিজয়কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন সেইসময় গোঁসাইজি রয়েছেন বৃন্দাবনে। ডঃ প্রাণগোপাল ভট্টাচার্য তাঁর 'পূর্ণব্রহ্ম বারদীর শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী' গ্রন্থে লিখছেন, 'গোঁসাইজি সেদিন সন্ধ্যায় তাঁর আসনে সমাসীন। হঠাৎ এক পরিচিত কণ্ঠস্বর তিনি শুনতে পেলেন 'বিজয়কৃষ্ণ আমি তোর কাছে এসেছি সূক্ষ্মদেহে।' গোঁসাইজি চমকে উঠলেন। একী! স্বয়ং ব্রহ্মচারী বাবার প্রতিমূর্তি যে!...সূক্ষ্মদেহধারী বাবা লোকনাথ বললেন, 'বিজয়কৃষ্ণ, আমি অচিরে এ দেহ ত্যাগ করব। তুই আমার বারদীর আসনে গিয়ে বস। ওই আসনে বসবার মতো তোকে ছাড়া আর কারোকে দেখছি না।' তা শুনে গোঁসাইজি বললেন, 'আমার এখন বৃন্দাবন ধাম ছেড়ে যাবার যো নেই। এখানে এক বছর থাকব বলে সঙ্কল্পকরে আসন পেতেছি।'

বাবা বললেন, 'তা হলে দেহ ছেড়েই দিই।'

গোঁসাইজি বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে করুন। আপনার দেহের প্রতি আমার এতটুকুও মায়া নেই।'

বাবা বললেন, 'একথা বলছিস কেন রে?'

বাবার এই প্রশ্নের উত্তরে গোঁসাইজি বললেন, 'আপনি ইতিমধ্যে অনেক ক্ষতি করেছেন। অদ্বৈতবাদ শিক্ষা দিয়ে অনেককেই 'অদৃষ্ট' 'প্রারব্ধ' বলে তাদের মন বিগড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের সংশোধন করা কষ্টসাপেক্ষ। তাছাড়া আপনার কথা লোক বুঝতে পারে না, তাই তারা অনেকসময়েই ভুলপথে যাচ্ছে।'

বাবা গোঁসাইজিকে বললেন, 'বিজয়কৃষ্ণ, জানিস যার যেমন সংসার সে আমার কথা তেমনই বোঝে।...যাদের জন্যে থাকা তারাই যখন আমাকে চিনল না, আমার দ্বারা যখন তাদের কোনো উপকারই আর হবে না, তখন আর থেকে কি লাভ? আমি দেহ ছেড়ে দিচ্ছি।'

বাবার কথা শুনে গোঁসাইজি বললেন, 'আপনার যা ইচ্ছে তাই করুন। আমার কিছু বলার নেই।' মুহূর্ত মধ্যে সেখানে এক দমকা হাওয়া বয়ে গেল। বাবা লোকনাথ ব্রহ্মচারী অদৃশ্য হলেন।

কিন্তু গোঁসাইজি তাঁর বংশের অতি বৃদ্ধ পুরুষের ওপর কেন অত রেগে ছিলেন! কেন তিনি লোকনাথ ব্রহ্মচারীকে দেহ ছাড়তে নিষেধ করলেন না। এব্যাপারে তিনি নিজে আমাদের কোনও কিছু না জানালেও শ্রীমৎকুলদানন্দ ব্রহ্মচারীর লেখা পড়ে অনেক কিছুই জানা যায়।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দেহাশ্রিত অবস্থার কতক সময়ের দৈনন্দিন বৃত্তান্তের সঙ্কলন 'শ্রীশ্রী সদগুরু সঙ্গ'। এটি লিখেছিলেন তাঁরই কৃপাধন্য কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। তিনি লিখছেন, 'শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, 'ওরে তোর কিছু বলবার থাকলে এখন বল।'

সেইসময় তাঁর সঙ্গে কুলদানন্দের অনেক কথা হল। একসময় লোকনাথ ব্রহ্মচারী গোঁসাইয়ের কথা তুলে বললেন, 'গোঁসাই দেশবিদেশে আমাকে মহাপুরুষ বলে প্রচার করে আমার সর্বনাশ করলে। পঁচিশ বৎসর কাল আমি এখানে বেশ ছিলাম, এখন রোগীর চিৎকার আর মামলা মোকদ্দমার কথা উদয়াস্ত আমি শুনি। এই জন্যই কি আমি এখানে আছি। শালা অন্ধ, মুরুক্ষু। কচি কচি ছেলেগুলোকে যোগশিক্ষা দিচ্ছে আর বলে 'পরমহংসজী পরমহংসজী'।' এই প্রকার নানা কথা গোঁসাইকে বলিয়া, আমাদের সাধনের কুৎসাও করিতে লাগিলেন। আমি সেসব কথা শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলিলাম।'

কুলদানন্দ গেণ্ডারিয়ায় ফিরে এসে গোঁসাইজিকে লোকনাথজির সব কথা বললেন। সব শুনে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বলেছিলেন, 'এখন তোমাদের যে কেহ ব্রহ্মচারীর নিকটে যাবেন, তাঁকেই তিনি একবার 'নাড়া-চাড়া' করবেন। আমাকে তিনি আক্ষেপ করে বলেছিলেন 'মুনি ঋষিদের 'কলজে' তুই শেয়াল কুকুরগুলোকে বিলাচ্ছিস।' আমি বললাম, যেমন পরমহংসজী আদেশ করেন তেমনি আমি করছি। তিনি বললেন 'আচ্ছা আমি একবার বেশ করে দেখব।' তাই এখন তিনি আরম্ভ করেছেন। এতে তোমাদের আর কি? আমাকেই পরীক্ষা করছেন। তিনি বলেছিলেন তোর 'নাড়ি ভুঁড়ি' আমি টেনে বের করব। এখন তিনি তাই করছেন। যত পারেন করুন! তবে, তোমরা এখন কেহ সেখানে গেলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। একথা সকলকেই বলে দেওয়া ভাল।'

মনে হয় সেইজন্যেই শ্রীশ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারীর সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এইরকম ব্যবহার করেছিলেন। লোকনাথজি ফিরে এলেন বারদীতে। শুরু হল বিদায় নেওয়ার প্রস্তুতি। আর কদিন বাদেই তিনি লীন হবেন ব্রহ্মে। তারিখটা হল ১২৯৭ সালের ১৯ জ্যৈষ্ঠ, রবিবার।



সাধু হরিদাস ও মহারাজা রণজিৎ সিংহ

সাধু হরিদাস। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর 'সাধু হরিদাস' গ্রন্থের টাইটেল পেজে সাধকের পরিচয় দিতে গিয়ে লিখছেন, 'মহারাজা রণজিৎ সিংহ যে সাধুকে চল্লিশ দিন মৃত্তিকায় পুতিয়া যোগবল পরীক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার উপাখ্যান।' মহারাজা রণজিৎ সিংহের মন্ত্রী রাজা ধ্যান সিংহ সেইসময় জম্মুতে থাকতেন। তখন তাঁর সভায় যাঁরা আসতেন তাঁরা সবাই এক অলৌকিক সাধুর নানা ক্ষমতার গল্প করতেন। প্রথমদিকে রাজা সেইসব গল্পে তেমন মনোযোগ দিতেন না। কিন্তু তিন-চার মাস কেটে যাওয়ার পরও সেই সাধুর জনপ্রিয়তা বিন্দুমাত্র কমলনা, বরঞ্চ দিন দিন বেড়েই চলল। মন্ত্রী ধ্যান সিং একদিন সভায় বসে আছেন এমন সময় বেশ কয়েকজন অতিথি সভায় এসে সাধু হরিদাসের গুণগান করতে শুরু করলেন। একজন বললেন, 'তিনি হলেন গুটিকা সিদ্ধ। (কামতন্ত্রে লিখিত আছে, রূপা ও রাঙ্গের ঠুলি করিয়া তন্মধ্যে কালপেঁচার চক্ষু রাখিয়া গুটী নির্মাণ করিতে হয়। ওই গুটী মুখে রাখিলে মানুষ অদৃশ্য হইতে পারে।) ইচ্ছা করিলে অদৃশ্য হইতে পারেন, নিমেষ মধ্যে ত্রিজগৎ ঘুরিয়া আসেন। অনেকে তাঁহাকে জলের ওপর দিয়া ছুটিয়া বেড়াইতে দেখিয়াছেন। তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিয়া গ্রন্থ পাঠ করেন, সম্মুখে কেহ দাঁড়াইলে না দেখিয়া তাহার নাম বলিয়া দেন। জয়স্রোতে তাঁহাকে তিন মাস মাটির ভিতর পুঁতিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহাতেও সন্ন্যাসীর মৃত্যু হয় নাই। মৃত্তিকায় পুঁতিলে তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস থাকে না, শরীর স্পন্দনহীন হইয়া যায়। অমৃতসরে আবার তাঁহাকে প্রোথিত রাখা হইয়াছে, এবার তিনি একমাস কাল মৃত্তিকার মধ্যে থাকিবেন।' রাজা সেই অতিথির কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠলেন। তখন সেই অতিথি ও অন্য সভাসদরা বললেন, মহারাজ সন্ন্যাসী এখনও মাটির তলাতেই আছেন। আর দিন দুয়েক বাদে তিনি মাটির তলা থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনি চাইলে আপনাকে আমরা সেখানে নিয়ে যেতে পারি। ধ্যান সিংহ তাঁদের কথায় প্রথমে তেমন আমল না দিলেও পরদিন সকালে তিনি তাঁর কয়েকজন দূতকে অমৃতসরে পাঠালেন। এবং তাঁদের বলে দিলেন, যদি সমস্ত ব্যাপারটা সত্য বলে মনে হয় তাহলে সাধুকে উপযুক্ত শ্রদ্ধা ও সম্মান দিয়ে এখানে নিয়ে আসবে। কিন্তু যদি প্রতারক বা ভণ্ড বলে মনে হয় তাহলে কিছুই বলবে না। তাড়াতাড়ি আমার কাছে ফিরে আসবে।

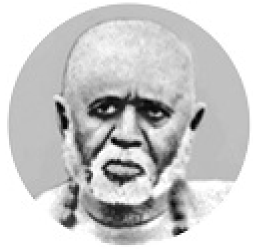


দূতেরা অমৃতসরে পৌঁছে দেখলেন সাধু তখনও মাটির তলাতেই আছেন পরদিন তাঁকে মাটির ওপরে তোলা হবে। তবে সেই সমাধির কাছে কারোই যাওয়ার উপায় নেই। কারণ সশস্ত্র প্রহরীরা সেই সমাধিস্থল ঘিরে দাঁড়িয়ে আছেন। পরদিন একটু বেলার দিকে মাটি খুঁড়ে সাধুকে ওপরে তুলে নিয়ে এলেন তাঁর শিষ্যরা। সাধু হরিদাসের শরীরে তখন কোনও প্রাণের চিহ্ন ছিল না। সমাধির একপাশে তিনি মৃতের মতো পড়ে ছিলেন। ইতিমধ্যে কেটে গেছে বেশ অনেকটা সময়। হঠাৎই ঘটল সেই অলৌকিক ঘটনাটি। সাধুর শরীরে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল। তার কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ভূমি শয্যা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

দূতেরা সাধুর এই অলৌকিক কাণ্ড দেখে তখন স্তম্ভিত। ঘোর কাটার পর তাঁরা সবাই মিলে পরামর্শ করে তাঁদেরই একজনকে ধ্যান সিংহের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আর বাকীরা সাধু হরিদাসের সঙ্গে দেখা করে রাজা ধ্যান সিংহের পরিচয় দিয়ে বললেন, মহারাজ আপনাকে জম্মুতে তাঁর অতিথি হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন। আপনি দয়া করে একবার আমাদের সঙ্গে চলুন। কিন্তু হরিদাস জম্মু যেতে রাজি হলেন না। প্রায় একমাস ধরে ধ্যান সিংহের দূতেরা বহু চেষ্টা করেও সাধুকে রাজি করাতে পারলেন না। এদিকে ধ্যান সিংহও সাধুকে দেখার জন্য ভীষণই উতলা হয়ে উঠেছেন। কিন্তু সাধু হরিদাস কিছুতেই জম্মু আসতে রাজি হচ্ছেন না। অগত্যা ধ্যান সিংহই চলে এলেন অমৃতসরে। তাঁর কাতর মিনতিতে হরিদাস জম্মুতে যেতে রাজি হলেন। পরদিন সকালে শিষ্য সহ সাধু মহারাজের সঙ্গে জম্মুর উদ্দেশে রওনা হলেন।

জম্মুতে পৌঁছবার বেশ কিছুদিন পর রাজা ধ্যান সিংহের অনুরোধে সাধু হরিদাস আবার মাটির তলায় যেতে রাজি হলেন। এইবার তিনি টানা চারমাস মাটির তলায় থাকবেন। সমাধিতে বসবার আগে সাধুর নির্দেশে রাজার ক্ষৌরকার তাঁর সমস্ত গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে দিলেন। টানা চারমাস মাটির তলায় থেকে একদিন দ্বিপ্রহরে তার শিষ্যরা তাঁকে মাটির ওপরে তুলে আনলেন। সেই আগের মতো বেশ কিছুক্ষণ তিনি মৃতের মতো পড়ে রইলেন। তারপর একটা সময় গা ঝেড়ে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। আশ্চর্যের বিষয় এই চারমাসে তাঁর দাড়ি-গোঁফ কিছুই বেরোয়নি।

পশ্চিম রাজ্যে তখন হরিদাসের প্রবল পসার। অফিসে, ক্লাবে তখন তাঁকে নিয়ে সাহেবদের মধ্যে নানা আলোচনা চলত। শোনা যায় লর্ড বেন্টিঙ্ক ও লর্ড অকল্যান্ড, দুজনেই সাধু হরিদাসের সম্পর্কে সত্য-মিথ্যা জানার জন্য রাজপুতানা ও পাঞ্জাবের এজেন্টদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এইসময় পুষ্করে সশিষ্য সাধুর সঙ্গে দেখা হল রাজপুতানার সহকারী এজেন্ট মিঃ ম্যাকনটেনের।

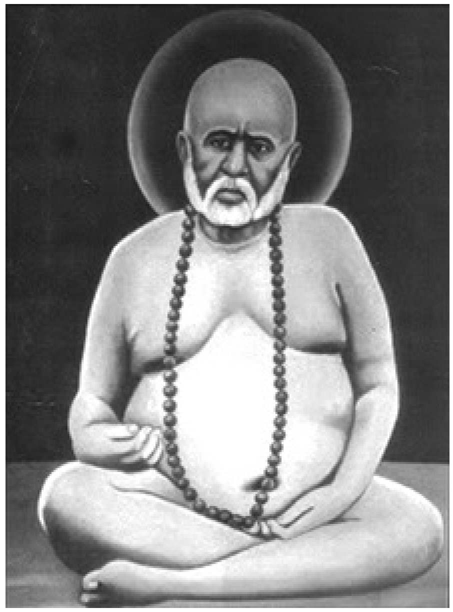


সাধু হরিদাস ও ত্রৈলঙ্গস্বামী

পুষ্করে সাধু হরিদাসের সঙ্গে দেখা হল মিঃ ম্যাকনটেনের। সদ্য দেশ ছেড়ে ভারতে এসেছেন সাহেব। ফলে হিন্দি ভাষাটা তাঁর তখনও তেমন রপ্ত হয়নি। ম্যাকনটেন সাধুর সঙ্গে কথা বলার জন্য একজন দোভাষী নিয়োগ করলেন। সেই দোভাষীর সাহায্যে শুরু হল দুজনের কথাবার্তা। ম্যাকনটেন সাধু হরিদাসকে কলকাতায় যাওয়ার অনুরোধ করলেন। কারণ স্বয়ং বড়লাট বারবার চিঠি লিখে সাধুর সম্পর্কে জানতে চাইছিলেন। কিন্তু হরিদাস কলকাতায় যেতে সম্মত হলেন না।

সাধু যখন কলকাতায় যেতে রাজি হলেন না তখন সাহেবেরও মনে হল এই সাধু অবশ্যই ভণ্ড ও প্রতারক। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থে লিখছেন, 'ম্যাকনটেন সাহেব দেখিলেন আর অনুরোধ করা মিথ্যা। হরিদাস কলিকাতায় যাইবেন না। অতএব এইখানেই একবার পরীক্ষা করা যাউক। এইরূপ স্থির হইলে পুষ্করেই তাঁহার বুজরুকি দেখিবার সমস্ত আয়োজন হইল। এবার তাঁহাকে মৃত্তিকায় পুঁতিয়া রাখা হয় নাই। তিনি আসনবন্ধনপূর্বক ধ্যানে বসিলে ম্যাকনটেন তাঁহাকে সিন্দুকে পুরিয়া আপনার ঘরে ঝুলাইয়া রাখিলেন। তের দিন অতীত হইলে সিন্দুক খুলিয়া দেখা হইল হরিদাসের সংজ্ঞা নাই, সর্বাঙ্গ শুকাইয়া কাষ্ঠের মত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কিয়ৎকাল পরে সেই শরীরে আবার প্রাণ সঞ্চার হইল।'

কে ছিলেন এই হরিদাস সাধু! তিনি কি কাশীর সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গ মহারাজের শিষ্য ছিলেন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়ের লেখা পড়ে সেইরকমই তো মনে হচ্ছে। মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হরিদাসের বয়স তখন পনেরো বা যোলো বছর। সেইসময় তাঁদের বাড়ির কাছে একটি গাছের তলায় এক সন্ন্যাসী তাঁর আসন পাতলেন। একগাছি বেতের লাঠি ও একটি নারকেলের কমণ্ডলু ভিন্ন সেই সন্ন্যাসীর কাছে আর কিছুই ছিল না। সাধুর উপস্থিতি ওই অঞ্চলে অল্পদিনের মধ্যে আলোড়ন ফেলে দিল। এলাকার ধর্মপ্রাণ মানুষজন প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যাবেলায় নিজেদের সাধ্যমতো আহার্য ও পানীয় সাধুকে দিয়ে আসতেন। হরিদাসও অবসর পেলেই সেই গাছতলায় গিয়ে সন্ন্যাসীর পাশে চুপটি করে বসে থাকতেন। সন্ন্যাসীও হরিদাসকে বেশ পছন্দ করতেন। এইভাবে বেশ অনেকগুলো দিন কেটে গেল।



প্রতিদিনের মতো সেদিনও সকাল হল। এলাকার মানুষজন তাঁদের প্রাত্যহিক কাজকর্ম সেরে ফল, দুধ ও জল নিয়ে সেই বৃক্ষতলে এসে দেখলেন শুধুমাত্র পড়ে আছে গতরাতের নিভে যাওয়া ধুনির কিছু ছাই। সন্ন্যাসীকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। সাধু চলে গেছেন জেনে সবাই মনে খুব ব্যথা পেলেন। বেশ কিছুক্ষণ সময় তাঁরা সেখানে কাটিয়ে ফিরে গেলেন নিজের নিজের বাড়িতে। কিন্তু সেদিন একটু বেলা বাড়ার পর আবার হইচই শুরু হল। কারণ হরিদাসকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সকলেই অনুমান করলেন হরিদাস ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই গৃহত্যাগ করেছে। তাঁদের অনুমান যে সত্য তা কিছুদিন বাদেই সবাই জানতে পারলেন। ওই এলাকার এক বাসিন্দা কোনও কাজে পুষ্করে গিয়েছিলেন। সেখানেই তাঁর সঙ্গে হঠাৎই সেই সন্ন্যাসী ও হরিদাসের দেখা হয়ে যায়। তিনি খোঁজখবর করে জানতে পারেন সন্ন্যাসীর নাম ত্রৈলঙ্গস্বামী।

স্বামীজির শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন হরিদাস। গুরুর নির্দেশে শিষ্য হরিদাস মস্তক মুণ্ডন করে ত্যাগ করলেন পৈতে। শুরু হল কঠিন যোগশিক্ষা। তবে সেটা পুষ্করে নয়, তখন তাঁরা রয়েছেন কুরুক্ষেত্রে। শিষ্য কী ধরনের আহার করবেন তাও বলে দিয়েছিলেন ত্রৈলঙ্গস্বামীজি। প্রথম চারমাস হরিদাস দিনে কেবলমাত্র একবার আহার গ্রহণ করতেন। তিনমুঠো সরু চাল, এক সের গোদুগ্ধ, অল্প ঘি এবং সামান্য চিনি পাক দিয়ে তৈরি হত তাঁর আহার্য। জল পান করতেন না তিনি।

একাদশী, পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিন তিনি কেবল মাত্র আধসের দুধ খেতেন। পরবর্তী চারমাসে তিনি একদিন অন্ন ও পরের দিন কেবলমাত্র দুধ খেয়ে কাটালেন। এবার একাদশী, অমাবস্যা ও পূর্ণিমাতে তিনি জল পর্যন্ত গ্রহণ করতেন না। শেষ চারমাসের তপস্যা ছিল আরও কঠিন। অল্প ময়দা ও চিনি দুধে গুলে তিনি পান করতেন। পরদিন খেতেন কেবল মাত্র আধসের দুধ। তৃতীয় দিন নিরম্বু উপবাস। এর সঙ্গে ছিল আসনবন্ধন। রঙ্গলালবাবু লিখছেন, 'সাধু পায়ের ওপর পা রাখিয়া কুশাসনের উপর সোজা হইয়া বসিতেন। চক্ষু অর্দ্ধোন্মোলিত ভ্রূযুগলের মধ্যে স্থাপিত। বামহস্তে দক্ষিণ পদের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ধরিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে দক্ষিণহস্তে মালা ঘুরাইতেন।' এইভাবে টানা ত্রিশ বছর তিনি প্রাণায়াম অভ্যাস করে সমাধিসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

সাধনা চলাকালীন সাধু হরিদাসের যোগনিদ্রা আরম্ভ হল। তিনি কঞ্চির তীক্ষ্ন টুকরো দিয়ে জিভের নীচের দিকের চামড়া খানিকটা কেটে সেই ক্ষতস্থানে দুধ ও ঘি মালিশ করতে শুরু করলেন। এইভাবে পুরো চামড়া কাটতে তাঁর প্রায় তিন মাস সময় লেগে গেল। এবং ক্ষতস্থান শুকিয়ে যাওয়ার পর হরিদাস সাধু খেচরীমুদ্রা দ্বারা জিভকে ভিতরদিকে উলটিয়ে বায়ুধারণ করতে শুরু করলেন। একটা সময় পেট ও ফুসফুসের সমস্ত

বায়ু ব্রহ্মতালুতে উঠে যখন আগুনের মতো উত্তাপ তৈরি করল তখন সাধু সমাধিতে বসার জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমে তিনি কুরুক্ষেত্রে সমাধিতে বসেন। তবে প্রথমবার তিনি কেবলমাত্র চব্বিশ ঘণ্টা মাটির নীচে কাটিয়েছিলেন। ক্রমশ তিনি সময় বাড়াতে শুরু করেন এবং একসময় তিনি সমাধিসিদ্ধ যোগী হিসেবে পরিচিতি প্রাপ্ত হন। কর্নেল ওয়েড সাহেবের কেরানি জওলাপ্রসাদ একবার হরিদাসের সমাধিকালে উপস্থিত ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালে লিখলেন, ‘The sadhoo came from the Decan with his disciples to Lahore and was perfectly skilled in the art of Samadhi.’



চল্লিশ দিন মাটির তলায় কাটালেন সাধু

১৮৩৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। আলোর মালায় সেজে উঠেছে লাহোর। আর কদিন বাদেই কুমার নবনিহাল সিংহ বিয়ের পিঁড়িতে বসবেন। ইতিমধ্যে দেশ-বিদেশ থেকে অতিথি-অভ্যাগতরা আসতে শুরু করেছেন। কাকতালীয় ভাবে সেইসময় লাহোরে শিষ্যদের নিয়ে এসে পৌঁছলেন সাধু হরিদাস। কুমারের বিয়ে উপলক্ষে ধ্যান সিংহও তখন লাহোরে। একদিন মহারাজা রঞ্জিত সিংহকে সাধু হরিদাসের কথা জানালেন ধ্যান সিংহ। সাধুর সব কথা শুনে মহারাজা নাকটা একটু কুঁচকে বলেছিলেন, এসব অলীক গল্প। সাধু তো এখন লাহোরেই আছেন। তিনি যদি আমার চোখের সামনে এই ব্যাপারগুলো ঘটাতে পারেন তবেই আমি তা বিশ্বাস করব। নাহলে কিছুতেই নয়।

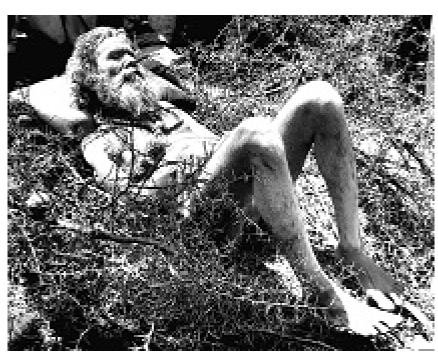
ধ্যান সিংহ বললেন, এটা কোনও ব্যাপার নয় মহারাজ। আপনি আদেশ করলেই আমি সাধুকে আপনার কাছে নিয়ে আসতে পারি।

মহারাজ বললেন, আগে বিয়ের কাজটা মিটে যাক। তারপর তুমি সাধুকে রাজসভায় নিয়ে এস।

বিয়ের কাজকর্ম মিটে যাওয়ার পর ধ্যান সিংহ সাধুকে নিয়ে রাজসভায় এলেন। সেদিন মহারাজ তাঁর অমাত্য ও সেনাপতির সঙ্গে কোনও জরুরি বিষয় নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন। ধ্যান সিংহের মুখে সাধু হরিদাসের আগমনবার্তা শুনে তিনি নিজে উঠে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়ে প্রণাম করে বললেন, 'সাধুবর! আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি। একটা জরুরি আলোচনা চলছে। আপনাকে আজ একটু অপেক্ষা করতে হবে।'

মহারাজের কথা শুনে সাধু হরিদাস বললেন, 'আমি অপেক্ষা করছি। আপনি আলোচনা সেরে আসুন।'

সেদিন হরিদাস সাধুর সঙ্গে তাঁর সাতজন শিষ্য রাজসভায় এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে রামতীর্থও ছিলেন। তিনি হলেন সাধুর প্রধান শিষ্য। তাঁদের নিয়ে সাধু মহারাজের অপেক্ষায় বসে রইলেন। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর মহারাজ রঞ্জিত সিংহ সাধুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন।



আসতে দেরি হওয়ার জন্য মহারাজা প্রথমেই সাধুর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বললেন, 'যোগীবর আপনার কথা ধ্যান সিংহের মুখে অনেক শুনেছি। আমার ইচ্ছা আপনি লাহোরেও মাটির তলায় সমাধিতে বসুন।'

হরিদাস বললেন, 'মহারাজ, আমাকে এক সপ্তাহ সময় দিতে হবে। কারণ আমাকে কিছু অনুষ্ঠান ওই সময়ের মধ্যে করতে হবে। তবে আমার একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতে হবে। এবার আমাকে আর মাটির তলায় প্রবেশ করতে বলবেন না।'

'কেন মাটির তলায় নয়!' সাধুর কাছে জানতে চাইলেন মহারাজা।

উত্তরে সাধু বললেন, 'আমার প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকে। সম্প্রতি আমি তিনমাস মাটির তলায় ছিলাম। সেইসময় নানা ধরনের পোকার আক্রমণে আমার শরীর ক্ষতবিক্ষত হয়ে গিয়েছে। এখনও কিছু ঘা সম্পূর্ণরূপে শুকোয়নি। আমার অনুরোধ, আপনি আমাকে একটি লৌহসিন্দুকে পুরে বড় একটি গাছের ডালে ঝুলিয়ে রেখে আপনার সন্দেহ মোচন করুন।'

মহারাজা রঞ্জিত সিংহ সাধুর প্রস্তাবে রাজি হলেন না। তিনি বললেন, 'আপনাকে মাটির তলায় সমাধিতে বসতে হবে। শুধু তাই নয় যোগে বসবার আগে আপনি যেসব প্রক্রিয়া করবেন তা আমার সামনেই করতে হবে।'

অগত্যা সম্মতি জানিয়ে সাধু শিষ্য সহ রাজপ্রাসাদ থেকে বিদায় নিলেন।

পরদিন হরিদাস আবার ফিরে এলেন রাজপ্রাসাদে। মহারাজা সাধুর থাকার ব্যবস্থা করলেন রাভী নদীর তীরে অবস্থিত এক সুরম্য প্রসাদে। জাওলা প্রসাদ লিখছেন, 'Aud was placed in the Baraduri of the Garden called Sardar Gowla Singh Bhuraniawalla, situate on the banks of Rawi river.'

নির্দিষ্ট দিনে মহারাজা তাঁর আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে প্রাসাদের সুরম্য উদ্যানে উপস্থিত হলেন। সাধু হরিদাস মহারাজকে দেখে বললেন, 'মহারাজ! ধর্মসাক্ষী, চল্লিশ দিনের বেশি আমাকে মাটির ভেতরে রাখবেন না।'

রঞ্জিত সিংহ যোগীকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, 'আপনি কোনও চিন্তা করবেন না। তার মধ্যেই আপনাকে ওপরে তুলে আনা হবে।'

ইতিমধ্যে ক্ষৌরকার এসে গেছেন। সাধু তাঁর সামনে বসে পড়লেন। ক্ষৌরকার তাঁর নখ কেটে, চুল, দাড়ি ও গোঁফ কামিয়ে দিলেন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'একখানি ধৌত গেরুয়াবস্ত্রের উপর পায়ের ওপর পা রাখিয়া এবং হৃৎপদ্মে দুই হস্তে মুদ্রাবন্ধন পূর্বক উদগ্রব হইয়া বসিলেন। শিষ্যেরা কর্ণে, চক্ষে ও নাসিকায় ঘৃত মাখাইয়া তুলা এবং মোম দ্বারা ওই সকল ইন্দ্রিয়পথ বন্ধ করিয়া দিল। হরিদাস দেখিলেন সমস্ত পূর্বানুষ্ঠান শেষ হইয়াছে, তখন তিনি জিহ্বা উল্টাইয়া তালুর ভিতর প্রবেশ করাইলেন। অমনি শ্বাস-প্রশ্বাস অনেক বিলম্বে এক একবার মৃদু মৃদু বহিতে লাগিল, কিঞ্চিৎ পরে একবারে বন্ধ হইয়া গেল। শিষ্যেরা হৃদয়ে হাত দিয়া দেখিল, স্পন্দন নাই, ওষ্ঠ মলিন হইয়াছে, দেহ শীতল হইয়া গিয়াছে। তখন তাঁহারা রণজিৎ সিংহকে কহিল, এক্ষণে মহারাজের যেমন ইচ্ছা হয় করিতে পারেন।'

মহারাজ নিজে যোগীকে পরীক্ষা করে অবাক হয়ে গেলেন। এরপর তাঁর নির্দেশে শিষ্যরা যোগীর বসার আসন ও গায়ের কাপড় একসঙ্গে বেঁধে দিলেন। তারপর আরও একখানি কাপড় সাধুর সর্বাঙ্গে জড়িয়ে সেলাই করে দেওয়া হল। কাজ মিটে যাওয়ার পর রঞ্জিত সিংহের নির্দেশে এক রাজকর্মচারী সেলাইয়ের স্থানে স্থানে গালা দিয়ে মহারাজের স্বনামের মোহর মেরে দিলেন। এরপর রাজার খাজাঞ্চি বলরাম মিশ্র সাধুকে একটি কাঠের বাক্সে পুরে তাতে নিজের হাতে তালা ও তার ওপর মোহর মেরে দিলেন।

এতকিছু করা সত্ত্বেও সাধুর ওপর তখনও মহারাজের বিন্দুমাত্র বিশ্বাস জন্মায়নি। তাই কাঠের বাক্সটি মাটিতে পোঁতার পর রাজার নির্দেশে তাঁর অনুচররা ওই স্থানে যবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সমাধি স্থানের

চারদিকে পাঁচিলও তোলা হয়। এবং সেখানে সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত করা হল। মহারাজ বাক্সের চাবি ও মোহর বলরাম মিশ্রের কাছ থেকে চেয়ে নিজের কাছে রেখে দিলেন।



সাধুর অলৌকিক কীর্তি দেখে সাহেবরা অবাক হলেন

দেখতে দেখতে তিন দিন কেটে গেল। সাধুর কবরের ওপর ইতিমধ্যে যবের অঙ্কুরও বের হতে শুরু করেছে। চতুর্দিকে কেবল সাধু হরিদাসকে নিয়ে আলোচনা। প্রতিদিনই কত শত মানুষ সেই উদ্যানের সামনে এসে ভিড় জমাচ্ছেন। কিন্তু ভিতরে প্রবেশের কোনও অনুমতি কারও নেই। মহারাজা রঞ্জিত সিংহের নির্দেশে প্রহরীরা উদ্যানের ওই অংশে কড়া নজরদারি চালাচ্ছেন। এইভাবে দেখতে দেখতে ত্রিশ-বত্রিশ দিন কেটে গেল। যব গাছগুলি এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। বাগানের এই অংশের চেহারা এখন সম্পূর্ণ পালটে গেছে। মহারাজও প্রতিদিন একবার করে এসে সবকিছু তদারক করে জান।

উনচল্লিশ দিনের মাথায় গভর্নর জেনারেলের কোনও আদেশ নিয়ে প্রায় পাঁচশো সেনা সঙ্গে রাজসভায় এসে পৌঁছলেন পলিটিক্যাল এজেন্ট ক্যাপ্টেন ওয়েড। মহারাজ রঞ্জিত সিংহের সঙ্গে প্রয়োজনীয় কথাবার্তা শেষ হওয়ার পর রাজার নির্দেশে ফকির আজিজুদ্দিন সাহেবকে সাধুর সমস্ত কাহিনি শুনিয়ে বললেন, আগামীকাল সাধুকে মাটির ওপরে তোলা হবে। ওয়েড সব শুনে গাঁজাখুরি গল্প বলে ব্যাপারটা উড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন মহারাজা বললেন, সাহেব আজকের রাতটা তোমরা এখানে থেকে যাও। আগামীকাল পুরো ব্যাপারটা নিজের চোখে দেখেই না-হয় ফিরে যেও। ক্যাপ্টেন ওয়েড তাঁর সঙ্গী ও পুরো পল্টন নিয়ে রাজার অতিথি হয়ে রাজপ্রাসাদেই থেকে গেলেন। এই প্রসঙ্গে জওলাপ্রসাদ লিখছেন, 'When this period was about to expire, Colonel Wade the Political Agent of the British Government, arrived at Lahore with a staff of English officers (including Dr. Murray and Dr. McGregor) on a mission from the Governor General.' অর্থাৎ ক্যাপ্টেন ওয়েডের সঙ্গে দুজন সাহেব ডাক্তারও রাজসভায় উপস্থিত ছিলেন।

পরদিন সকাল থেকেই সেই উদ্যানের সামনে প্রায় মেলা বসে গেল। অল্পবয়স্ক ছেলেপুলেরা গাছের ওপরে চেপে বসলেন। বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর সপার্ষদ মহারাজা রঞ্জিত সিংহ সেখানে এলেন। তিনি সেখানে প্রবেশের কিছুক্ষণ বাদে ক্যাপ্টেন ওয়েড, ডাক্তার মুরে, ম্যাকগ্রেগর ও অন্যান্য সৈন্যরা উদ্যানে এসে পৌঁছলেন। মহারাজের আদেশ পাওয়ার পর খাজাঞ্চি বলরাম মিশ্রের নির্দেশে কর্মচারীরা প্রথমে চারদিকের পাঁচিল ভেঙে দিলেন। তারপর শুরু হল মাটি খোঁড়ার কাজ। তোলা হল কাঠের বাক্স। মহারাজের কাছ থেকে চাবি নিয়ে বলরাম মিশ্র নিজের হাতে মোহর ভেঙ্গে বাক্সের ঢাকনা খুললেন। দেখা গেল সাধু সেই একই ভাবে বসে আছেন। বাক্স থেকে তাঁকে বের করে আনলেন শিষ্যরা। তাঁরা সেলাইয়ের মোহর ভেঙ্গে কাপড় সরিয়ে দিলেন। প্রথমেই তাঁকে পরীক্ষা করতে গেলেন দুই সাহেব ডাক্তার। অনেকক্ষণ পরীক্ষা করার পর তাঁরা বললেন, এই মানুষটির দেহে প্রাণের কোনও অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাচ্ছিনা। অতএব আমরা

একে মৃত বলে ঘোষণা করলাম। তবে কেউ যদি এই দেহে প্রাণের সঞ্চার করতে পারেন তাহলে তাঁকে আমরা অবশ্যই ঈশ্বরের মতো শক্তিমান বলে মনে করব।

সাহেব ডাক্তাররা সরে যাওয়ার পর শুরু হল শিষ্যদের কাজ। প্রথমেই তাঁরা সাধুর মাথায় ঠান্ডা ও পরে ঈষদুষ্ণ জল ঢালতে লাগলেন। স্নান পর্ব শেষ হওয়ার একখানি বড় রুটি তাওয়া থেকে নামিয়ে হরিদাসের মাথার ওপর বসিয়ে দিলেন। এরপর নাক, কান, চোখ ও মুখের তুলো খুলে দিয়ে সেইসব স্থানে শিষ্যরা জোরে জোরে ফুঁ দিতে লাগলেন। এইসব হয়ে যাওয়ার পর একজন শিষ্য গুরুদেবের জিভে ঘি মাখিয়ে দিলেন। এইবার সাধুর দেহে ধীরে ধীরে প্রাণের সঞ্চার হতে শুরু করল। তিনি শব্দ করে শ্বাস নিতে লাগলেন। এইসময় তাঁর দেহের উত্তাপও প্রবল ভাবে বেড়ে গিয়েছিল। দুই সাহেব ডাক্তার তাঁকে পরীক্ষা করতে ছুটে গেলেন কিন্তু সাধুর গায়ে তাঁদের হাত স্পর্শ করা মাত্র তাঁরা চিৎকার করে উঠেছিলেন। কারণ তাঁদের হাতে ছাকা লাগার অনুভূতি হয়েছিল।

বেশকিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর তাঁরা দুজনেই সাধুর নাড়ি পরীক্ষা করে দেখলেন, নাড়ি চলছে তবে খুব ধীরে ধীরে। এই পরীক্ষা চলাকালীনই এক শিষ্য গুরুদেবের চোখে ঘি লেপে দিলেন এবং অন্য দুই শিষ্য তাঁর পায়ে ঘি মালিশ করতে শুরু করলেন। রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় লিখছেন, 'ক্রমে দেহের তাপ স্বাভাবিক হইয়া আসিল। যোগী কথা কহিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কথা ফুটিল না। তাঁহার পাশেই স্বয়ং মহারাজ বসিয়া ছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া যোগী অনায়াসে চিনিতে পারিলেন।...আরও কিছুক্ষণ পরে যেন সে মানুষ নন, সেই শুষ্ক শরীর প্রফুল্ল হইল, হাসিভরা মুখমণ্ডল ঢলঢল করিতে লাগিল। তিনি সহজ মানুষের মতো সকলের সঙ্গে কথা কহিলেন। সাহেব মণ্ডলী অবাক, কাহার মুখে আর কথা সরে না। ডাক্তার মুরে (কেহ কেহ বলেন সেনাপতি গার্ডনার সাহেব হরিদাসের প্রতিমূর্তি আঁকিয়া লইয়াছিলেন) স্বহস্তে তাঁহার প্রতিমূর্তি তুলিয়া লইলেন। রণজিতের আজ্ঞানুসারে চতুর্দিকে বিজয়বাদ্য বাজিতে লাগিল। লাহোরনগর কামানের গুড় গুড় শব্দে কাঁপিয়া উঠিল।'

তৃপ্ত মহারাজা রঞ্জিত সিংহ সাধুকে নানা উপহারে শুধু পুরস্কৃত করলেন না, তাঁকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন। অবশ্য এই সম্পর্ক আমৃত্যু অটুট থাকেনি। মহারাজের ওপর ক্ষুব্ধ হয়ে সাধু হরিদাস তাঁকে অভিশাপ দিয়ে একদিন রাজপ্রাসাদ ছেড়ে চলে যাবেন। তারপর তাঁর সঙ্গে মহারাজের আর কখনও দেখা হয়নি।

পরবর্তী সময়ে মহারাজের আদেশে তাঁর কর্মচারীরা সাধুর অন্বেষণে বেরিয়ে সাধুর প্রধান শিষ্য রামতীর্থের সন্ধান পান। তাঁকে মহারাজের সামনে উপস্থিত করা হলে তিনি জানান, 'একমাস আগে আমাদের গুরুদেব স্বেচ্ছায় দেহত্যাগ করেছেন।' এই খবর পেয়ে অতিশয় ভেঙে পড়েছিলেন মহারাজ রঞ্জিত সিংহ।